www.risidalai.com

বর্ষ ১৪ | সংখ্যা ১১ | অক্টোবর ২০২৫

সমকালীন কবিতা সংখ্যা

www.risidalai.com
বর্ষ ১৪ | সংখ্যা ১১ | অক্টোবর ২০২৫

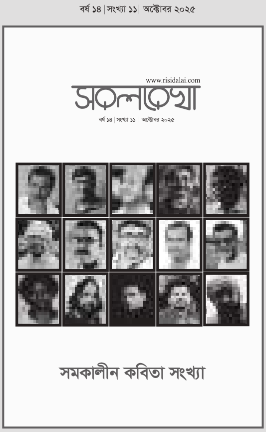

বড্ড অস্থির সময় উদ্‌যাপন করছি আমরা। মবসন্ত্রাসের পাশাপাশি ধর্মীয় উন্মাদনাকে কাজে লাগিয়ে একশ্রেণির মানুষ অরাজক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে বিকারহীনভাবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সম্মিলিত হামলা হচ্ছে, হামলা হচ্ছে মাজারসহ অন্যান্য স্থাপনায়। হত্যা করা হচ্ছে নৃশংসভাবে। উগ্রবাদকে আমরা কখনো সমর্থন করি না, এদেশের ইতিহাস -ঐতিহ্য তা অনুমোদন করে না। এখানে সব ধর্ম মতের মানুষের নির্বিচার অংশগ্রহণ ছিলো- আছে, যা থামিয়ে দেয়া যাবে না। সুফি-বৈষ্ণবদের হাত ধরে এখানে সাম্য-মৈত্রী-প্রেমের বিজয়গাঁথা ধ্বনিত হয়েছে।

দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করতে চাই, অনির্বাচিত ফেরেস্তার চাইতে নির্বাচিত স্বৈরাচারও শ্রেয়। কারণ নির্বাচিত স্বৈরাচার আমাদের মনোনীত। তাকে প্রশ্ন করা যায়, বলা যায় তুমি যা করছো তা ঠিক করছো না। চরম অস্থিরতার মধ্যে একটি জাতি এভাবে দিনের পর দিন চলতে পারে না। কিছুতেই না। বিকারহীন আমরা। যেন কিছুই দেখছি না। কিছুই করার নেই। একশ্রেণির মানুষ সাময়িক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নানা অপকর্ম করছে। গণ-অভ্যুত্থানের স্বপ্নকে বিপথগামী করছে। এই উন্মাদদের অপকর্মের জন্য আমরা গণ-অভ্যুত্থান করিনি। শুধু সরকার পরিবর্তন উদ্দেশ্য ছিলো না। আমরা চেয়েছি সত্যিকার পরিবর্তন। এদের এখনই থামাতে হবে, এদেরকে থামান।

‘সমকালীন কবিতা সংখ্যা’য় পনেরো কবির কবিতা ছাপা হলো। এই সময়ের লিখিয়ে কবিদের মধ্য থেকে পনেরো কবি’র কবিতা নির্বাচন সহজ ছিলো না। সময়ের প্রভাব বিস্তারকারী কবিদের মধ্যে নিঃসন্দেহে তারা স্বতন্ত্র, অগ্রগণ্য। কাব্যিক গভীরতা, দূরদর্শিতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দার্শনিকতা, বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট তাদের কবিতার মেজাজ-ভাবনাকে সমৃদ্ধ করেছে, করেছে অনন্য। বিষয় নির্বাচনেও তাদের মৌলিকতা লক্ষ্যণীয়।

www.risidalai.com
www.charbak.com

সম্পাদক

রিসি দলাই

প্রচ্ছদ

ইসফাক রায়হান

প্রকাশক

রুবিনা সুলতানা

কম্পোজ

সংবর্ত

৬৪/সি/১ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, টিকাটুলি, ঢাকা

মুদ্রণ

সারকো মিডিয়া এইড সার্ভিসেস

১১৯ সরদার গলি, ফকিরেরপুল, মতিঝিল, ঢাকা

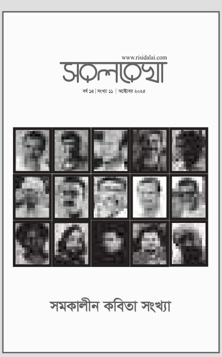

সম্পাদকীয় যোগাযোগ

৬৪/সি/১ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, টিকাটুলি, ঢাকা

editor_charbak@yahoo.com
editor.charbak@gmail.com

মুঠোফোন +৮৮ ০১৫৫২-৪১৯৪৪২

মূল্য

দুই শত টাকা (বাংলাদেশ)

তিন শত টাকা (ভারত), দশ ডলার (অন্যান্য)

নিয়মিত আড্ডার

২৭
বছর

সাহিত্য আলোচনা ও আড্ডা

আপনি আমন্ত্রিত

শুক্রবারের আড্ডা

www.risidolai.com

৬৪/সি/১ রামকষ্ণ মিশন রোড, টিকাটুলি, ঢাকা

আমাদের প্রকাশনা

চারবাক

বাংলাদেশের কণ্ঠস্বর

সমকালীন কবিতা সংখ্যা

ফয়েজ আলম ৭

আহমেদ নকীব ১৪

খলিল মজিদ ২০

আকমল হোসেন নিপু ২৬

জহির হাসান ৩২

জ্যোতি পোদ্দার ৩৯

কাজী নাসির মামুন ৪৪

মালেকুল হক ৫১

ওয়াহিদ রোকন ৫৬

মুজাহিদ আহমদ ৬১

শামীম মেহেদী ৬৪

শামসুদ্দোহা শোয়েব ৬৭

আরণ্যক টিটো ৭৫

মারুফুল আলম ৮০

রিসি দলাই ৮৬

রিসি দলাই'র বই

কবিতার বই

মায়াহরিণ

সম্পাদনা

বুদ্ধিজীবীর আত্মজিজ্ঞাসার দলিল

বুদ্ধিজীবীর দায়ভার

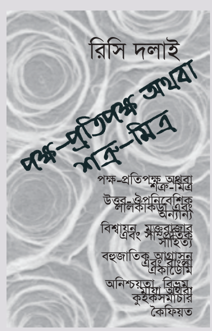

প্রবন্ধ

লিটলম্যাগ ও প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা নিয়ে

বিশ্লেষণমূলক প্রবন্ধ সংকলন

পক্ষ-প্রতিপক্ষ অথবা শত্রু-মিত্র

ফয়েজ আলম

জন্ম ১৯৬৮ সালে নেত্রকোনা জেলার আটপাড়ার যোগীরনগুয়া গ্রামে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ (সম্মান) ও এমএ পাশ করার পর প্রাচীন বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণার জন্য এমফিল. ডিগ্রী লাভ করেন। গুরুত্বপূর্ণ কাজঃ ব্যক্তির মৃত্যু ও খাপ-খাওয়া মানুষ (কবিতা, ১৯৯৯); এডওয়ার্ড সাইদের অরিয়েন্টালিজম (অনুবাদ, ২০০৫); উত্তর-উপনিবেশি মন (প্রবন্ধ, ২০০৬); কাভারিং ইসলাম (অনুবাদ, ২০০৬), ভাষা, ক্ষমতা ও আমাদের লড়াই প্রসঙ্গে (প্রবন্ধ, ২০০৮); বুদ্ধিজীবী, তার দায় ও বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব (প্রবন্ধ, ২০১২), জলছাপে লেখা (কবিতা, ২০২১); ভাষার উপনিবেশঃ বাংলা ভাষার রূপান্তরের ইতিহাস (প্রবন্ধ, ২০২২), রাইতের আগে একটা গান (কবিতা, ২০২২), আমারে উড়াও ধুলা (২০২৪), বাঙালির ইতিহাস চর্চার পথের কাঁটা (২০২৪); যখন রুহুরে হারায়া ফেলি (কবিতা, ২০২৫)।

রুহুর মইদ্যে রইদের বসত

নতুন কোন কাল্পনিক ও আদর্শ ভাষার বদলে একেবারেই মাটির কাছের যে ভাষাকে আমরা ব্রাত্য বানিয়ে ফেলেছি তাই জায়গা করে নিয়েছে আমার কবিতায়। যেখানে জীবনের অভিজ্ঞতার চাষ সেখানেই আমার সফর। এই সফর নান্দনিক, রাজনৈতিক ও রুহানিয়াতের বিভিন্ন পর্দা অতিক্রমণের সফর। কখনো বা পাঠক নিজেকে আবিষ্কার করতে পারেন এমন এক গ্লোবাল ভিলেজের বাজারী হিসাবে যাকে 'ভব বাজার' নামে আমাদের গ্রামবাংলার কবিরা বোঝাপড়া ও মোকাবেলার চেষ্টা করছেন। সেই বাজারে ওয়াল্টার বেনিয়ামিন একজন ফ্লানিউরের মত বিপ্লবের কারবারী হিসাবে নিজেকে হাজির হওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন। আমি মনে করি কবিতা একই সাথে উত্তর-উপনিবেশি রাজনীতি, ভাবচর্চা আর নন্দনের সুষম মেল। একারণেই আমার কবিতায় কখনো চর্যাপদের পদকর্তাদের, কখনো গ্রামবাংলার বাউল ফকিরদের গানের সুর ও রূপকের সাক্ষাত পেতে পারেন।

চিনা-আনচিনার মইদ্যে আমি যখন নিজের অস্তিত্বে পুনঃপ্রত্যাবর্তন করি, তখন মনে হয়- এই তো আমি, এটিই সত্য। তফাৎ শুধু এই রাত্তির আমি'র সাথে দিনের চিরচেনা আমি'র কোথায় মিল?

পথের লেখা

আমি তো পথের ঘোরে
কতদূর হাঁটি
ভাবি এই পথ মোকামের দিকে
তবু মোকামে না ফিইরা কেন পথেই ঘুরতেছি।

গন্তব্যের আগেই কারো নাদেখা পায়ের দাগে
আরেক পৃথিবীর পর্দা উঠতেছে কোনোখানে
আমি আর তার পথুয়া না, আড়ালের দর্শক মাত্র
লেখা হইতেছি কোনো ঝরা বটপাতার গায়
বিকালের মনমরা রৈদ।

পথ যাইতেছে পথ বদলায়া
আমার না-দেখা কোনো দূরে
মিলতেছে অন্যকোনো পথের নিশানা
এইখানে থাকতেছে তার একমাথার ইতিহাস
পথে পথে গড়ানির হু হু গান।
অচল পুরানা পথে
পায়ে পায়ে নিরালায় আঁকতেছি পাতাপড়া সুর।

সকালে না-গাওয়া গীত

তুমি তো নিঃশব্দই থাকতে চাইছিলা
যাতে আঁকুপাঁকু না-বলা কথার মাঝখানে আমরা
বনেলা ঘাসফুল হয়া ফুইটা থাকতে পারি।

স্বপ্নের লেখাজোকা
সকালের ফুঁপানো কান্দনগুলা পার হয়া
শেষে তুমি ফুটলা চাউল ডাইল সবজি জীবনে।
আমি নিত একই পাথর
গড়ানো সইন্ধার দিকে
ফুটতেছি এইপথ সেইপথে আনমনে বেহুদার লেখা।

তোমার নাকওয়া কথা কোনখানে আঁকুপাঁকু
করে কি করে না কে জানে!

আমার কথাগুলি প্রতিদিন
সিজদার পাশেই রাখতেছি
আমাদের উজানীর ঘাটে।

আমার মেয়েরা যখন কীবোর্ড বাজায়

আমার মেয়েরা কীবোর্ড বাজানোর সময় ভাবি
কী বোর্ডের একটা আত্মা আছে
অনচিনা পাখি সাইজা দিনরাইত বনে বাদাড়ে ঘুরে
কেউ বাজাইতে গেলে উইড়া আইসা বসে মেশিনের মনে,
মানুষের কত শত বছরের না-কান্দা দুঃখুগুলারে
তখন সে একলাই কান্দে আঙ্গুলের নিচে।

বাজানো শেষ হইলে আমি আফসোসের কাছে বসি,
জীবনে কীবোর্ড বাজানো শিখলাম না কেন, আহা!
ডাইনে বাঁয়ে উপরে নিচে আঙ্গুল নাড়ায়া-চাড়ায়া ভাব ধরি
যদি ভুলে আমারে বাজনদার ভাইবা
তার আত্মা আইসা জায়গা লয় ফের
আমার আঙ্গুলের নিচে
তাইলে আমিও তার সাথে সেইসব গোপন কান্না
কিছু কানতে পারতাম
মাঝে মাঝে উড়তে পারতাম গাছে ডালে এতিমের উড়াউড়ি।

দেখি ভিতরে হারানোর মত গভীর উঁশ
তবু আঙ্গুলে উঠে না
কি এক সুর জানি ইশারা দিয়াই
বেবান হাওড়ে মিলায়।
তবু আমি আমার ভিতরে বদলাইতে থাকি
তার গায়েবি আত্মার কাছে সিজদা দিয়া বলি
ওগো আত্মা কীবোর্ডের
তুমি একবার আইসা কাঁন্দ
আমার আঙ্গুলের নিচে।

আমার নফসের যত দুঃখু
রুহুর সকল বেদনা তোমার ঠোঁটে লও
আমার গলায়া তুমি নামাও জীবনের যত যত উঁশ
জাহেরি বাতেনি,
দূর কোনো অজানা সইন্ধার আগের
শেষ আলোর মত
আমারে উড়ায়া দাও গায়েবের দিকে।

কানাওলি জোছনার নিশানা

তুমি বুঝি কানাওলি জোছনার নিশানা!
যেদিকেই পাও মেলি
তোমার দেওড়িতে গিয়ে ঠেকে মুখ।
ছায়া পইড়া থাকে পথে পথে।

সুর থেকে শব্দ শুষে নিয়ে
তোমার নিঃশব্দে আমার সকল গান আজ নিরাকের হাহাকার।
রক্তের প্রত্যেক বিন্দুতে কেবল তোমার
স্বেদ কিবা বিষ পড়ে আছে।

যে-তিরাস পথে পথে ঝরে
আমি জানি তোমার তালুতে তার নিবারণ নাই।
তবু পীরিত আর ঘেন্নার ভেতর
এই ঘোর লাগা হাওয়া বুকে নিয়া
আমি কোথায় চলেছি?
আমার সকল পথই তো আজ
তোমার মধ্যে এক হয়্যা আছে।

সিলেট থাইকা ফিরার সময়

সিলেট থাইকা ফিরার সময়
আমরা প্রথমে সিলেট পার হই
জানালার বাইরে তখন আশ্বিনের রৈদ
ভিতরে মরা পাতারা উড়তেছে
চৈতের আসরে।
এইরকম ঘোর বেমিলে
সেইটা ছিল একটা কঠিন কাজ।
শেষে একটা অনচিনা বাজার পার হওয়ার পরে
মনে পড়ে আমরা একটা লম্বা সফরে আছি!

বহু গ্রাম বাজার বটতলা
দেখা ও না দেখা দৃশ্যের কাতার
পার হয়াই যাইতে হবে
মানুষের মুখ
তার হাসি
গোপন ও জাহির কত ভালোবাসাবাসি
আমরা কেবলই পার হয়া যাব।

মিরপুর বাজারের কাছে আমাদের মন
বেশ হালকা হালকা লাগে

আসরের মরা রৈদের ভিতরেও ফুরফুরা
চা খাই বিস্কুট খাই
সিগারেটের সাথে ভুলেভালে কয়ঢোক দুক্‌খুও খায়া ফেলি।

মৌলভীবাজার পার হয়া সন্ধ্যার ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে
মনে পড়ে আমরা তো লম্বা সফরে!
চোখের পলকে সিলেট পার হয়া আসছি।
আর, এখন সইন্ধ্যার ধুয়াগুলা পার হওয়ার সময়
আমাদের দূরের উঁশের কথা মনে পড়ে
আরও আরও সইন্ধ্যার কিনারায় দুঃখের ভার
আমাদের যত চলাচল
মনে পড়ে।

এই ঘোরে
গন্তব্য বুঝার আগেই আমরা আমাদেরও পার হয়া যাই
লম্বা সফরে অনচিনা বেদনার উঁশ
সন্ধ্যা পার হয়া ঝইরা পড়তে থাকি
রাইতের উরের ভিতর।

সিলেট থাইকা ফিরার সময়!

দাগ মাত্র

নামতেছি
রক্ত মাংস দেহঘড়ি থাইকা
শাদা কাগজ একখান

লেখ কাল, লেখ মানুষেরা, লেখ জীব
কালের আঁচড়
চারপাশে সকলেই কিছু
লেখালেখি আঁকাআঁকি
কিছু লেখা কর
শাদার ওপর

শাদা কাগজ শাদা থাকেতেছে না
আঁকিবুকি, দাগ, কিছু কালি
প্রকাশ হইতে চাইতেছি তো!
পিছে ছায়া কিছু
তার মায়া
কি বেদনা
রক্তের না-দেখা দাগ

মুইছা যাইতেছে
মুইছা যাইতেছি
মুছা হইতে চাইতেছি না
তবু কাল!

আহা কি নিদারুণ!
যেন মুছে
কি তুচ্ছ
বুড়া আঙ্গুলে টানা বালুতে এক দাগ
সাগরের ঢেউ

উপনিবেশের কায়াবদল

কালা পিঠে সাদা হাতের চাবুক পড়ে
কুস্বপ্নের রক্তজবুল
সুতানটি-পলাশির ঘোরে
ঘুরপাক আমাদের বাসনার যত গান
আমার মায়ের সব সোনাদান
কালা মাথায় জাহাজে উঠতেছে।
তবু বাঁইচা থাকি
কালের হরফ বদলায়া খোদাই
এই কেবলই বাঁচনের নাম।
আচানক গোলামির ব্যাকরণ লেখা হয়
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে
ইতিহাসে আমরা বাঁইচা আছি যুগ যুগ।

কোন্‌দিন সাদা হাত কালা হয়
আমরা জানি না
কালা হাতের জোর বাড়ে
চাবুকের বদলে সে ছুঁড়ে বুলেট
কালা পিঠে
আমার মায়ের সোনাভরা জাহাজ পাচার
কখনো থামে না।

সিনেমা দেখার আগে

সিনেমা দেখার আগে আমরা স্ক্রিপ্ট দেখি
পথে শাহবাগের মোড়ে একটু বসি চায়ের দোকানে
উঠতি বয়সের ছেলে ও মেয়েরা কে কারে চোখ মারতেছে
আমরা মজা পাই
মৌসুমের আগেই আমরার ছেলেমেয়েরা সাবালক হইতেছে!

চাঅলারে কই 'মামা' তাতে কিছুটা সাম্যবাদ হইল
পায়ে পড়ে না তার মাথার ঘাম
শার্ট ভিজতেছে বলে ভাবা যায়
আহা এই শট কি দারুণ--
যত দূর যাইতে পারি মধ্যবিত্তের শিল্পকলা
ততদূর দাড়ায়া কই, ঠিক পথের প্যাঁচালের মত, দারুণ দারুণ!
নিদারুণ হইলো না কি!
রিক্সাঅলারে জিগান যাইতে পারে নিদারুণ তার জীবন
প্যাডেলের পাশ দিয়া অতঅত দামি গাড়ি
আসমান ছোঁয়া বিল্ডিংগুলার নিচ দিয়া
স্ক্রিপ্ট দেখা চলতেছে

মধুমালা নার্গিস সাবানের বাঁসে আমরা শেষে
উত্তেজিতই হয়া পড়তাছি মনে হয়
কাজেই এই সময় গুলির শব্দ মোড়ে মোড়ে,
বেশ যায়, যাইতেই পারে
সিনেমার শেষের দিকে কিছু কিছু মারামারি
কিছু গলাবাজি
যদিও এইখানে স্ক্রিপ্টের ভিতর কেমন সুনসান বোবা মানুষেরা।

আমরা সিনেমা দেখতেছি কিছু লাশ পড়তাছে
তাতে তলে পড়তেছে সাবানের বাঁস
সহবাসের বদলে হাতমারা শেষ।
কাইল সকালে অফিসের কামের ফাঁকে এইখানে
মধ্যবিত্তের একটা বিপ্লবই হইয়া যাবে হয়তো।

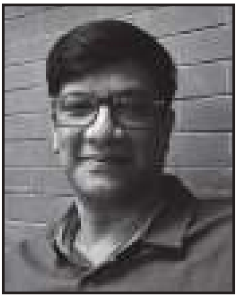

আহমেদ নকীব

জন্ম ২৭ জুন ১৯৬৫ সালে, ঢাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। দীর্ঘদিন ধরে সম্পাদনা করছেন ছোটকাগজ 'শিড়দাঁড়া'। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শিশু ও হারানো বিড়ালের কথা' (১৯৯৬)। কবিতা মূল বিষয় হলেও আশির শেষদিক থেকে বাংলাদেশে ছোটকাগজভিত্তিক সাহিত্য আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রেখে এসেছেন। ছোটকাগজ আন্দোলনের ২৫ বছর পূর্তিতে ছোটকাগজ বিষয়ক আকরিকগ্রন্থ 'স্বপ্নের সারসেরা' (২০১০) এর সম্পাদনা পর্ষদের অন্যতম সদস্য হিসেবে যুক্ত ছিলেন, যা ঢাকার উলুখড় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা, গল্প, মুক্ত-গদ্য ও স্কেচ সব মিলিয়ে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৬। অনুবাদ এবং আঁকাআঁকিও করেন তিনি।

দাঁতগুলোকে ঘুমাতে দাও

অনেক হয়েছে মাংস ছেদন আর কর্তন
এবার দাঁতগুলোকে ঘুমাতে দাও

হা হা করতে করতে পৃথিবী কাঁপাচ্ছো

হো হো করতে করতে বন্ধুকে হতবুদ্ধি
ক'রে পিঠ প্রদর্শন করছো

আর তোমার দাঁত এতো আলোর দাপট
নিয়ে ঠাঠা ক'রে উঠলো, চাঁদ ভীত হয়ে
চলে গেলো মেঘের আড়ালে-

আমরা বুঝলাম যুদ্ধ আসন্ন

দোকানের শাটারগুলি ঘর্ঘর শব্দে
দ্রুত বন্ধ করছে মানুষজন
অনেক হয়েছে মাংস ছেদন আর কর্তন
এবার দাঁতগুলোকে ঘুমাতে দাও

বাড়ির আত্মা

এবার আমরা আমাদের ঝুরঝুরে
বাড়িটাকে আবার জীবন দান করবো:

বুড়ো বাড়িটার আত্মা যেভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে,
আমরা সবাই মিলে তার চামড়ায়
চুনের লোশন ঘষে দেবো,
খসে পড়া পলেস্তারায় ছিটিয়ে দেবো
ফ্রিজের ঠাণ্ডা পানি;

বালুকণাগুলো চিকচিক করবে আবার,
কান পাতলে দেয়ালের বুকে
বালুর গভীরে শুনতে পাবো
সাগরের সুপ্ত গর্জন

পুরাতন দেয়াল ভেঙে যাক, বালু
তবে ফিরে পাক সাগরের প্রকৃত লাবণ্য

আমাদের নূতন দেয়ালে বিড়ালগুলো
আবার চুপচাপ বসে থাকবে আর
লেজ নাড়াতে থাকবে ঘনঘন
পাশেই তখন চড়ুই পাখিরা
কিচিরমিচির করবে তারস্বরে

কবেকার পুতে রাখা সেই তালের বিচি
পায়ের আওয়াজ পেয়ে নড়েচড়ে বসবে,
যেনো আমরা খুব সহজেই
তাদের খুঁজে পাই মাটির কোরকে
আর যাদুমন্ত্রে সফেদ শাঁসগুলো বেরিয়ে
আসবে মাটি ভেদ ক'রে
সময় থাকতে থাকতে চলো খোঁজ নেই,
মরিচা পড়ার আগেই তেলের উষ্ণতায়
তালাগুলোর হাড়হাড্ডি মেরামত করা দরকার
চাবি ঘোরাতেই যেনো তালার অন্তর খুলে যায়,
যেনো দরজার কলিজায় টোকা দেয়া মাত্রই
নরম হয়ে ওঠে ইটের কঠিন হৃদয়

এবার তাহলে বাড়ির তালা ও চাবির
রতিক্রিয়ার বন্দোবস্ত হোক, যেনো
আমরা আমাদের তৃষ্ণার্ত দিলগুলো
খুলে দিতে পারি পরস্পর

সূর্যের চাকা

সুস্বাগত, বললো আজ সকালে
একটা থ্যাতলানো ইঁদুর আর
কোথায় সেই চাবি, তাকে খুঁজে পেলে
পারতাম ইঁদুরটাকে জ্যান্ত ক'রতে?

হলুদ পাতা সবুজ পাতা
খয়েরী পাতা পিছন থেকে
বললো তারা তারস্বরে সুস্বাগত,
সুস্বাগত! পাতাগুলো পিছে পিছে
আসে কিছুদূর, ঘূর্ণি তুলে পাক
খেয়ে ওড়ে চারদিক ঘিরে

ছোটখাটো একটা খোয়া ওঠা
গর্ত সেও জানালো সুস্বাগত!

একটু পরেই বৃষ্টি নামবে আর
গর্তে একটা টলটলে চোখ
জন্ম নিবে, সেই চোখে ভেসে
উঠবে একফালি আকাশ
দেখলাম, পিঁপড়ের সারি মার্চ করছে
আর স্যালুট দিয়ে বললো, সুস্বাগত
তারা বেশ সুশৃঙ্খল আর বুক টানটান
কোন্ বাসা থেকে গড়িয়ে এলো
ছলাৎছলাৎ পানি, এই রাস্তা বেয়ে
আর ওই রাস্তা পেরিয়ে যেতে যেতে
সুস্বাগত, সুস্বাগত ব'লে হামাগুড়ি
দিচ্ছে পানি, আমার পা-জোড়া-
তেমনি তরতরিয়ে সামনে এগোয়

তখন ক্রলিং ক'রে রোদ এগিয়ে
এসে বুক জড়িয়ে ধরলো,
সেও বললো সুস্বাগত, আর
রোদের আম্মা সূর্যকে ধন্যবাদ
দিলাম হাত তুলে, এই মর্ত্য থেকে

সূর্যের চাকা কে চালায়, কে?
কোন্ সে হাত ঘুরাচ্ছে তার অনাদি
চক্র, যার শক্তিতে আজ সকালে
সবাই জানিয়ে গেলো সুস্বাগত!

মিষ্টির আত্মা

পুকুর ঘাটের হাত ছড়ানো
কোলে একটা ব্যাঙকে রেখে আসলাম

ছাদকে বললাম, কালিমরিচদের
পাহারা দিও, যতক্ষণ না ওরা
আরো কুচকুচে কালো হয়

দরজাটাকে দেয়ালের কাছে
জিম্মা রেখে এসেছি, বলেছি,
পরেরবার এসে যখন তালা খুলবো,
চঞ্চল চামচিকাদের ফ্রি করে দিবো

কাদার মধ্যে ঢুকে যাওয়া পা-টা
বের করতে তো ইচ্ছা করছে না, পোড়া
নখগুলি প্রাকৃতিক ফ্রিজে একটু শান্তি পাক

প্যান্টের মধ্যে ছিটকে আসা সবুজ পানির
দাগ মুছবো না, ধুবো না তোমাকে প্যান্ট

ছোট মাছগুলিকে বললাম,
তোমরা এতো বড় হয়ো না,
তোমাদের মাথায় পোকা এসে
বাসা বাঁধুক তেমনটা কখনই চাই না:
তোমরা তেকোনা থাকো আজীবন

মিষ্টিগুলিকে বড় খোরার শিরার মধ্যে
ডুবিয়ে এসেছি, ওরা এতোক্ষণ চুলার
আঁচে ছিলো, এখন ঠাণ্ডা হচ্ছে শোকেসে

মিষ্টির আত্মার মধ্যে ঢুকে বসে থাকবো আর
কলিজাটা ধীরে ধীরে মধুর হবে আমাদের?

রক্তমাংস

রক্তমাংস রক্তমাংস, তুমি
একটা চড়ুই পাখি পশমে ঢাকা,
তুলতুলে ধুকপুক বুক;
রক্তমাংস রক্তমাংস, তুমি
একটা সবুজ জানালা, কাঠে থরথর,
গ্রিলে মোড়ানো আঁকড়ানো হাত

রক্তমাংস রক্তমাংস, তুমি
একটা সর্পিল ড্রেন আর গোল
হৃদয়ের লাল-বল, কাদায় গড়া;

রক্তমাংস রক্তমাংস, তুমি
একটা বিড়াল, বেগুনি রঙের,
ঢেউ ঢেউ লেজ, নখের
আঁচড় খয়রি জুতায়;

রক্তমাংস রক্তমাংস, তুমি
একটা ছাদ, বাঁক খাওয়া
রঙধনু সিঁড়ি দিগন্ত ছোঁয়া,
নিচে ছোটছোট মাথা আর ছাতা;

রক্তমাংস রক্তমাংস, তুমি
আব্বা আম্মা আর তার-ই
মাঝখানে আমি একা আর একা

৩৩ এর ফাঁদ

৩৩ এর ফাঁদে পা দিয়োছো তোমরা,
আমার বন্ধুরাও, তোমরা কি ৩ এর
মতো জিমন্যাস্ট, তোমরা কি ডলারের
দাম ১২৫ টাকা বুঝতে পারো না

আমারও গরুর গোস্ত প্রিয় এই কথা জানে
আমার আব্বা আম্মা আর কাছের বন্ধুরা

আমি জানি কোনটা চাপ কোনটা পুট
আর কোনটা সিনা, কোনটা গর্দান,
আমারও টানটান করা একটা সিনা আছে
সিনার ভিতরে একটা কলিজা আছে
আর আছে একটা চোখ, আমার দেশ আমার গর্দান

আমার বন্ধু যখন আহাজারি করছে, এখনো
টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে
তখন দলে দলে মানুষ আরো বেশি টাকা দিয়েই
১০০ ষাঁড়ের কুঁজ কেটে নিতে চাচ্ছে আর
এখান থেকেই দা বটি চাপাতির ঝনঝন শব্দ শোনা যাচ্ছে

সেই অসহায় পাথরকে বেঁধে রেখে

তারা শানাচ্ছে তাদের দাঁত আর জিহবা
পাথরের মুক্তি নাই, যেমন দরজার ফাঁদ থেকে
সত্যিকারের কব্জার মুক্তি নাই আর
এতো জান বাজি রাখার পরেও
তোমাদের বুদ্ধির ছিটকিনি খুলতেসে না কেনো

এতো বুক পেতে দিলো যারা তাদের রক্ত ছটফট করছে
এখনো আর এরপরও তোমরা বুঝতে পারছো না
সেই ডলারের কুশনে পাছা রেখে তোমাদের লেলিয়ে দিয়েছে
আর তোমাদের ভাইয়ের রক্ত তোমাদেরকে দিয়েই পান করাচ্ছে

৩৩ এর ফাঁদে পা দিয়েছো তোমরা

একটুকরা হীরা

এই পোড়া কয়লার বুকে একটুকরা হীরা তুমি
আর সব কাচ আর ইমিটেশন আমার কাছে

এখন আর জাপটে ধরি না ভয়ে তোমাকে
যদি এই মায়া আরো বেশি বিপদ ডেকে আনে
তাই দূর থেকেই চোখে চোখে রাখি তোমাকে
আর অল্প করেই হাসি বিনিময় করি আর একটা
কঠিন ভাব নিয়ে তাকাই যেনো দূরে সরে যাও

হাসতে হাসতে যদি আমরা কান্নার কারণ
হয়ে দাঁড়াই, যদি মিষ্টিগুলি সব লবণের টুকরা
হয়ে যায় আর যদি মধু সব তিতায় পরিণত হয়
তার আগেই লুকিয়ে ফেলি মুখ তোমার কাছ থেকে

বেঁচে থাকলে তোমাকে আবার একদিন
শূন্যে ছুঁড়ে দেবো আর হাত পেতে লুফে নিবো
হালকা পালকের মতো শরীর তোমার

এই পোড়া কয়লার বুকে একটুকরা হীরা তুমি
আর সব কাচ আর ইমিটেশন আমার কাছে

খলিল মজিদ

জন্ম ২৫ আগস্ট ১৯৭০ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমএ। কবিতা ও নন্দনভাবনার ছোটকাগজ একবিংশ'র নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। প্রকাশিত কবিতার বই পালকাপ্য (২০০০) ও তরল মন্দিরা (২০২৪)। কবিতার জন্য বামিহাল সাহিত্য পুরস্কার ২০২৪ অর্জন করেন।

বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নতুন কবিতা

শব্দ নিয়েই কবিতা, তবে সে শব্দের 'অপূর্ববস্তু নির্মাণক্ষমপ্রভা' থাকতে হয়। কবিতার আবহে আকৃত হচ্ছে শব্দের সমাজতত্ত্ব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস। বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের কবিতায় যে বিষয়টি সাধারণ ও বিশেষ উভয় অভিধায় চিহ্নিত করা যায় তা হল ঐতিহ্য পুনর্নির্মাণের অনন্য প্রেরণা। কবিতাকে বাংলার নিজস্ব শক্তিতে ও ব্যঞ্জনায় অনুভব করার প্রচেষ্টা সাম্প্রতিক কবিতায় প্রধান চারিত্র্য হিসেবে লক্ষ্যণীয়। কবিতার ভাবে ও ভাষায় নিবিড় প্রাচ্যবোধ এ সময়ের কবিতাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। কবিতার ভাষা প্রকরণে উত্তর-ঔপনিবেশিক ব্যঞ্জনাও আমাদের কবিতায় আকৃত হচ্ছে।

বাংলার প্রাচীন ভাষা, সংস্কৃত, এমনকি আঞ্চলিক ও আদিবাসীদের শব্দাবলি ও অনুসঙ্গ, প্রত্নস্মৃতি, লোককথা, মিথ, লোকধর্ম, শাস্ত্রাচার, মন্ত্রযোগ, তন্ত্র, আধ্যাত্মিকতা, লোকদর্শন, অধিবিদ্যা এ সময়ে কবিতায় শুধু অনুষঙ্গ হয়েই আসছে না, ভাষা ও প্রকরণের নতুন বিন্যাসের সন্ধানে একেবারে দেশীয় লোকোফর্ম নিয়েও নিরীক্ষা স্পষ্ট হচ্ছে তরুণ প্রজন্মের বাংলাদেশের কবিতায়।

বাচনের বহুরৈখিক বিস্তার, বিচিত্র প্রেক্ষাপটের চিহ্নায়ক এবং সময় ও পরিসরের সমস্ত জটিলতাকে ঐতিহ্যের আবহে স্থাপন করে নতুন কবিতার এই উর্বর ভূমি কর্ষিত হচ্ছে। যোগ হচ্ছে নতুন বাক-বিন্যাস। বিজ্ঞান ও তত্ত্ববিশ্বের সাম্প্রতিক চিন্তনের আলো ও সংকেত এসে পড়েছে কবিতায়। বাক্যবোধ, সময়চেতনা, অলঙ্কার ও অন্ত্যমিল কবিতার চিরবৈশিষ্ট্য বলে মান্য এ-সব বিষয়ে সাম্প্রতিক কালের কবিদের ব্যাপক আগ্রহ। বাংলা ভাষার স্বাভাবিক বাগ্‌বহুল ছন্দবোধ এ-সময়ের কবিদের অনেকের কবিতায় বেজে উঠছে যা ভবিষ্যতের বাংলা কবিতার জন্য বিস্তৃত পাটাতন তৈরি করবে বলে আশা করা যায়।

জন্মদিন

দেয়ালে ঝুলছে জন্মদিন। তার 'পরে আঁকা আছে
লাল-হলুদ সুগন্ধী। ওগো, শুভেচ্ছামুখর
পাঁপড়িসকল, ওগো, মোমের দীপালিসম
জ্বলন্ত পঁচিশ, কী নিদারুণভাবেই না তোমরা
আক্ষরিক! পার হয়ে গাণিতিক প্রহরাব্দ,
গত হয়ে সমূহ পঁচিশ, অবশেষে তুমি বৃত্তাবদ্ধ
চিহ্নিত চরশ।
জানালার গ্রিল গলে হেসে খেলে
আধিপত্যবাদী রোদের মতো ঢুকে তো পড়েছো,
ভেঙে তো দিয়েছো আমার আত্মরক্ষার অভিমানখানা।

বাঘিনী

বাঘিনীর পরাশ্রয়ে না-কি প্রশ্রয়ে
রহিমেরা বাড়ে মালঞ্চে
রূপবান, সে এক বাঘিনী বটে;
অরূপকথার বনে বারো দিনের স্বামী তার
উঠিলে চিতায়
বাঘিনী বনেই যেতে হয় তাকে;
দাঁতে কেটে সমূহ শৃংখল সে দাঁড়ায়
এসে দ্যূৎসভায়-
স্বয়ম্বরে রহিমেরা বুঝে নেয়
কতটা কোমল এই বাঘিনীর নারী-হৃদয়!

অ্যান ওশান অব মেমোরিজ

মনে রেখো সুতপা ফুলের কাঁটা
মনে রেখো রক্ত সাক্ষী গড়াই।

পৃথিবীর প্রতিটি নদীর জলে রক্তাক্ত এমন কাঁটা
কাঁদে, গড়িয়ে পড়ে, হারিয়ে যায়।

এক শতাব্দী পর আজ এই মুমূর্ষু সন্ধ্যায়
একটি দারুণ তীর এসে বিঁধেছে পদ্মার কাতর পলিতে।
হায়, আমার যুবতী পিতামহী মরেছে কলেরায়
হায়, আমার বৃদ্ধা মাতামহী ডুবে আছে আলঝেইমারে-
অ্যান ওশান অব মেমোরিজ, ভালোবাসা মরে না রে!
মনে আছে সুতপা ফুলের কাঁটা
মনে থাকে রক্তে লাল সন্ধ্যার গড়াই।

সপ্তশ্বাস

আমি শ্বাস নিই আর অন্তর্গত এক মুহূর্তের জল
ভিতরে ভরে ওঠো তুমি,
নিঃশ্বাস ফেলি
বাইরে বিস্তৃত হয় তোমার অভিমান পরাহত
থির অধীরতা।

আমি শ্বাস নিই আর ভেতরে ভরে ওঠে ধাতুরূপে ক্রিয়াশীল
অভিধানগুলি,
নিঃশ্বাস ফেলি
সম্পর্কিত হতে থাকে শব্দমূল কর্মে ও কারকে
সমাসবদ্ধ হতে থাকে জন্ম, অধিজন্ম।

আমি শ্বাস নিই আর ফোলে ওঠে গোপন কৌটাটি
অস্তিসমুদ্রের গভীরে যে পড়ে থাকে
পরাবাস্তবতায়
পড়ে থাকে কোডে ও ডিজিটে
মাইটোক্রিয়ায়,
নিঃশ্বাস ফেলি
আর খুলে যায় তার ছিঁপি
ভাষা পেয়ে যায় ভুলে যাওয়া সব মেটাফর
রক্তে, অভিজ্ঞানে, ধমনি-শিরায়, শুক্রে, বীজে, ক্রোমোজোমে
চক্রে চক্রে সমাসবদ্ধ হতে থাকে
ধাতুরূপী ক্রিয়াভিত্তিক ন্যারেটিভগুলি।

আমি শ্বাস নিই আর ধীরে ধীরে ভেসে ওঠে
দূরবর্তী সব জন্মের বিস্মরিত বর্ণলিপি
নিঃশ্বাস ফেলি
ফিরে পাবার আনন্দে ফুটতে থাকে উপাখ্যানগুলি
প্রাচীন পুঁথির ছন্দে শহরময় বর্ণমালার ক্যারিওগ্রাফি
এভাবেই লেখা হয় আমাদের অভিন্ন আত্মজীবনী।

আমি শ্বাস নিই আর ধৈর্যের মতো ধূসর রঙের চাবিগুলো
তালা ঝুলায়ে দেয় মেঘেদের মুখে
আর ধৈর্যকে ধারণ করে বজ্রের হৃদয়
শীতে জমতে থাকে বজ্রের ফণা ও অস্থিরতা,
নিঃশ্বাস ফেলি

পাড়া ভরে ছড়িয়ে পড়ে বজ্রপুত্র আর বৃষ্টিভাষার কন্যারা।
এদের মুখে কে আঁটে আর চাবি
এদের পায়ে কে পরাবে রীতির বাড়াবাড়ি
ধৈর্য্যকে ওরা হারিয়ে কেবল ফেলে।

আমি শ্বাস নিই আর সমস্ত ঢেউ ও বাঁকসহ এক নদী
ঢুকে পড়ে ঘরে, নিজেরি ঘরে
আমি সাঁতরে কিনারা পাই না আর
ভেসে যেতে থাকে আমার খেয়ে না-খেয়ে কেনা সব বইপুস্তক
ভেসে যেতে থাকে কায়ক্লেশে গুছিয়ে তোলা ছন্ন গেরস্থালি,
নিঃশ্বাস ফেলি
আমার বিহ্বলতার নীচে বেহুলার মতো ভেসে ওঠো তুমি।

আমি শ্বাস নিই আর জল, অঙ্গ এক কণা
মগজে মুগ্ধবোধ তুমি,
(উন্মিলিত শস্যেও রেণু সপ্রকাশ্যে নৃত্যপর
যেন ইচ্ছাফড়িং এক ভাবনাহীন খেলে যায়
উন্মাতাল বায়ুচক্রে লীলাচ্ছলে খেলে যায়
সারাগায় ইচ্ছাফড়িং এক খেলে যায়),
নিঃশ্বাস ফেলি
ভেতরে জয়শঙ্খ বেজে ওঠে মুগ্ধডানা উড়ার উৎসবে।

ফলশ্রুতি

যখন অনেক দূরবর্তী কোন জন্ম তার
রৌদ্র ও সন্তাপ নিয়ে মনে পড়ে যাচ্ছিল
যখন প্লাবনের পুরাকীর্তি নিয়ে
স্মরণীয় কোনো নদী ঢুকে পড়ছিলো কাব্যভাবনায়
যখন প্রকৃতি খুলে দিচ্ছিল তার
একান্নবর্তী যৌথতার সবুজ চড়াই
যখন সময় ঝরে পড়ছিল অন্তহীন সময়প্রপাতে
আর জল সঞ্চয় করছিলো কিছু চুম্বন আর জিজ্ঞাসার বিদ্যুত
একটি গলিত সূর্যাস্ত ঢাকা পড়ছিলো ভোরের হুল্লোরে;

যখনো নদীরা কোনো স্ত্রীবাচক নামে খণ্ডিত হয়ে যায়নি
সর্বোপরি মানুষের মাঠ ছিলো মৌমাছির প্রজাতন্ত্র ;

যখনো গোত্রের সকল পুরুষ ছিলো
আমাদের বাবা আর সকল যুবতী মা
যখনো চুম্বনই ছিলো মানুষের সবচেয়ে গভীর স্বীকৃতি
যখনো পাঁজরের হাড় ভেঙে মানুষেরা গড়ে নিত প্রাজ্ঞ প্রতিমা

পানির প্রহারে-নাচা রমনীর শিৎকারে লাল হয়ে যেতো রাতের বাতাস
বৃষ্টির পীড়নে চিরে যেতো জুঁইফুলের মধ্যরাত্রি;

যখনো মাঠে মাঠে সবুজ বিপ্লবের মতো ছিলো
ঘাসেদের গল্প বলার তাড়না
মেয়েদের উড়ন্ত যৌবনে ছিলো লতার কল্পনারীতি
আর পাতার উড়ে থাকার সবুজ অভিলাস লেগে থাকতো তাদের
গোল গোল দুধে
হরিণপ্রহরে তারা কুড়িয়ে নিত বাতাসের হাতখরচ;

যখনো কবিতা হয়ে ওঠেনি কোকিলের কানকথা
শব্দেরা কাকের কালো রঙই কেবল গায়ে পরতো না
ধারণ করতো তার কড়া সত্যবাদিতা;
তখন আমার ধমনীর লাল অন্ধকারে বেজে ওঠে পাঠশালার ঘণ্টা
আর যৌথতার সফেদ চুক্তির মতো লেখা হয় চিরবর্ষার গীতিকা

এ কোনো উদ্‌বোধন নয়
নয় নূতন কোনো পরিচয়।

বজ্রযান

জেনেছি তুমি আলোর অভিধান
আর জেনেছি তোমার সম তাপ
প্রতি জন্মে নির্ধারিত পাপ
বজ্রে আমার এমনি উদ্গান।

যেমন জল আদপে জল নয়
তেমন তুমি জানার বিস্ময়
তোমারি এক পরম হাহাকার
আমি, তাই তোমার অধি-আকার।

বজ্র অর্থ জেনেছি শূন্যতা
আমার গান জেনেছি বজ্রযান
আমি কি তবে শূন্যেরই ভিন্নতা
আমার গতি বজ্রে বহমান?

বিদ্যুতের ভিতরে যাওয়া যাক
কেবল গতি শুধুই ঘূর্ণন
একটি 'আমি' অন্য 'আমি'র মন
বলেছেন তো প্রফেসর ডিরাক।

শূন্য হইতে আমি শূন্য হলে
বজ্র অর্থ পরম নির্বাণ
দিব্যজ্ঞান আলোর মতো জ্বলে
অগ্নিমন্ত্রে বুদ্ধ ভগবান।

ধানসত্য কবিতা সিরিজ

এক

পিছনে জমিন যায় সোহাগী বিহান যায়
হাটিয়ার সুখ আর মুলিয়ার বাঁশি
সাগরগঞ্জের আলু যায় বেহাগ যায়
বিবাগী বৈকালী

তাই বটে বসে আছে
জীবন বিছায়েছে
পাড়ে নদীয়ার

নির্জনে বাজিয়ে মঞ্জরী ধূপরেণু করছে আরতি
রাখো গো গঙ্গা মাতা, রাখো মোরে এ মিনতি
আমার রক্তের রেণু বিছায়েছি পদে গো তোমার

জলেতে জীবন ধন জলেই মরণ
সে দেখেছে জল বড় উর্ধ্বগামী হয়
জলের আকার নেই
এই কথা কে তাহারে করাবে বিশ্বাস।

দুই

তাহারা পানির প্রাণ, তাহাদের মন থাকে
মটকীর ভিতর; জাবারের ধান থেকে
পোনার ঝাঁকের মতো পয়দা হয় শিশুদের প্রাণ
যেন সে কুণ্ডুলিনী, কলকল
পানির নহরখানি ধরে রাখে। সঞ্জীবনী ধান
তোমার গোমরখানি ফাঁক হলে
এ নদী শুকিয়ে তবে খাক।

এ ভরা আষাঢ় মাস, ধানের বৃষ্টির তোড়ে
নেমেছে রাধিকা বর্ষা এ গাঁয়ে।
সকল কিষাণজন
ধরেছে ধান্য ভজন
মাড়াইয়ের চক্রাকার একাগ্র সাধনে।

আসিবে আশ্বিন মাস, ক্ষীণস্তনা বৃদ্ধা রাধিকা এ গ্রাম যবে
মনুর মন্ত্রের মতো ধান ভবে বিশল্যকরণী হবে।

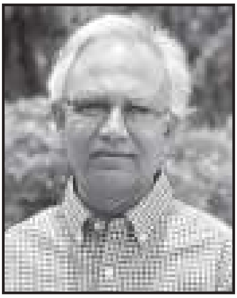

আকমল হোসেন নিপু

জন্ম ১৫ মার্চ ১৯৬২ মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলার মনসুরনগর ইউনিয়নের ধাইসার গ্রামে। যুক্ত আছেন সাংবাদিকতার সাথে।

প্রকাশিত গ্রন্থ

কবিতা: মেঘে যে তোমার বাড়ি (২০০৪), দুঃখের কোনো প্রতিবেশী নেই (২০১৬)।

গল্প: জলদাসের মৎস্য ঘ্রাণ, বুড়ি চাঁদ ডুবে যাবার পরে, আমরা খুব খারাপ সময়ে বেঁচে আছি, সাদা কাপড়ের শোক, রাতটা পূর্ণিমার ছিল, তার চোখের সামনে, নির্বাচিত গল্প, টিয়া পাখির পাথরকাল।

উপন্যাস: হলুদ পাখির ডাক অথবা অন্ধকারের নদী (২০০৮), ভূমিপুত্র অথবা হাওর পূরাণ (২০০৯), হীরামতি ও তার রাঁধুনীকাল (২০১৬), হাড়ের পাখি (২০১৮)।

কবিতা এমনই, একা নির্জনের মতো প্রিয়

কবিতা নিয়ে আলাদা করে খুব একটা ভাবি বলে মনে হয় না। মনে হয়, ওতো আমার সাথে মিলেমিশে থাকা এমন কিছু, যা আমার সকলদিনের সমস্ত বেদনা, কষ্ট-পীড়ন, আনন্দে বড় নিকট আশ্রয়। ওর সাথে পথ হাঁটতে হাঁটতে নির্ভার হই, কিছু পাই মুক্ত পালকের বোধ। সকল বিয়োগে-উদযাপনে কোনো না কোনো কবিতার পংক্তি এসে মৃদু ঢেউ তুলে, সকল পাথর সময়কে নেড়েচেড়ে আরও একবার লাবণ্যের দিকে চোখ ফেরায়, আরও একবার পৃথিবীর দিকে চোখ তুলে তাকানোর সংকেত দেয়। কবিতা এমনই, একা নির্জনের মতো প্রিয়, বহু ভিড়েও ছেড়ে না যাওয়া কিছু।

পাতাপ্রহরের বাঁশি

কি কাতর ঘুমের ঘোর, আজকাল
সমস্ত কিছুতে চাই পক্ষে থাক হাওয়া, কখন
যে মেঘ আসে, বৃষ্টি নামে, হারিয়ে যায়
পাতাপ্রহরের বাঁশি
কতদিন অযথাই পাহাড়ে ঘুরেছি
কী যে হলো এখন, পাহাড়ে অচেনা গাছ
তোমাকে ডাকছে যে, তাকে কি
চাইছো তুমি, তোমার ডাক কি শুনে
যাকে তুমি পাঠিয়েছো দক্ষিণ সমুদ্র-সুর

পোড়াজল উড়ে যায়, কিছু ছুঁতে পারি
বহুকিছু মনে হয় পথহারা পাখিদের সাথে
ঘুরেফিরে মরে, তোমার ঘামের গন্ধ
মুছে যায় শুকনো বাতাসে, মাঠ যেন শুধু এক
ফসলের মাতৃভাষা, দরজার ওপারে বসে
নিমগ্ন যে তাঁত বুনে রঙিন মেঘের
কে তাকে মনেই রাখে, উৎসব এখন
যাকিছু মুঠোয় ধরে, যাকিছু কুড়ানো যায়।

তবু নিঃশব্দ প্রহর

কাল তোমাকে খুব ডাকছিল
একটা পাখি, একটা বাঁশিও ছিল পাতার
তবু নিঃশব্দ প্রহর গেছে

এই আমার কানাকড়ি মূল্য নেই
তা জেনেইতো এসেছি রোদের গ্রামে
একটু হাওয়া পেলেই
পাতাগুলো এতটা আনন্দ পায়
কাশবন বুক খুলে ডাকে

পুরোনো মেঠোপথ হারিয়ে যাওয়ার কথা
শুনতেই এসেছি, লুপ্ত ধানের বীজ
হয়তো এখনও কেউ গোপনে
পুঁতে রাখে মাতৃ-তৃষ্ণাজলে

ফসলের মাঠের কাছেই
আমার মায়ের কবর সেই কবে থেকে
শুয়ে আছে, কাকে বলি যে আমি
পুড়ছি এখন, একদিন আমারও

নির্ভরতা ছিল এইসব বানানো, শাসানো
কাল থেকে দূরে মাটির গন্ধের ভেতর
এক টুকরো আলোর সন্ধ্যায়, রাতে
এই সীমিত-ভ্রমণে এতকিছু
চাইনি আমি, পাহাড়ে মেঘভাঙা
দেখতে দেখতে স্রোতের পাশ ঘেঁষে
একটা ঘর, হয়তো এরকম কিছুই না
ছাউনিটা আকাশেরই হতো।

বিস্মৃত গান

দুঃখ ভারাক্রান্ত হলেই কী, ফুলদের
হয় না কিছুই, পাখিদেরও না, একদিন
বিশ্বস্ত আগুন সেও পর হয়ে যায়

কারো কারো ইচ্ছেরাই এমন
কখনই ভিড়ে না কাছে, সন্ধ্যার মেঘ
হয়ে আসে, কাছেই রাত্রি থাকে
একলা করুণ বাঁশি কোন বনে বাজে
অনেকেই বিস্মৃত গান শুধু
কখন যে হারিয়েছিল পথের ভুলে

একদিন ফুলেরও ঘুম ভাঙে শাখে
লবণ সমুদ্র থেকে ভেসে আসে হাওয়া
পাতাদের সাথে পাতারাই
কত কথা বলে, আমাদের অন্যদিকে
মন, অনেকেই ঘুমে কাতর।

সন্ধ্যার মেঘ

মন খারাপের কারণগুলো মিথ্যে হলে
কী এমন ক্ষতি, এখন কি
রেশম ফলের মৌসুম
তাঁতঘরে মাঝেমাঝে তোমাকে দেখি
রঙিন সূতোগুলো কী জটিল
বয়নঘোরে শাড়ি হয়ে যায়
কতোকাল পাখিদের সাথে দেখিনি
তোমাকে, দিন কি তবে এরকমই, খাদ্য
আর শরীর মাপতে মাপতে
সবকিছু মিশে যাবে হাওয়ায়, ধুলায়

চোখভরা সন্ধ্যার মেঘ নিয়ে যে
বাড়ির দিকে হেঁটে যায়, তার উঠানে
মিথ্যে বাতিঅলা, বিপন্ন
হাওয়ার রাত, বাঁশির কান্না
সময় বদলে দেওয়ার কতো কথা বলে
বহুপথ পথেই হারিয়ে যায়।

একেকটি রাত

রাতচরা পাখিটি কি জানে, আমরাও সাথেই ছিলাম
গভীর অন্ধকারে আমাদের একেকটি রাত কুয়াশার ঘোরে
ঘুমিয়ে ছিল, আমরা দূরের নক্ষত্রের দিকে চোখ রেখে
দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেছি, ওপারেই ভোর ছিল

হাঁসের ছানার পাল মাঠে গেছে, আমরা ফসল খুঁজিনি
চাষবাসেই মত্ত ছিলাম, শুধু আলোর উৎস চেয়েছি
মাঠটা হেসে ওঠলে আমাদের ভালো লাগা পালক পেয়েছে
একদিন তোমার কাছে সঞ্চয় ছিল পর্যাপ্ত সময়

আমরা বাতাসেই বুঝে গেছি মেঘেদের ঘ্রাণ, কোথায়
বৃষ্টি নামবে, উন্মুখ জানালাগুলো পড়তে চেয়েছি
কাঙাল তৃষ্ণাগুলো উড়ে গেছে ঝড়ে, বটের শিকড়গুলো
কারা বুঝি টুকরো করে কুড়িয়ে নিয়েছে, ঝরে গেছে পাতা।

পাখির ফেরার গান

গাঙচিল মনেইতো নেই, পুড়ে যাওয়া
অনেক দুপুর, একটা আকাশ পাখিদেরই
ছিল, যারা সমুদ্রের সীমানা না জেনেই
পাড়ি দিতে পারে পথ

যে তোমারে ডেকেছিল মেঘের মৌসুমে
কী প্রয়োজন তাকে আর সন্ধ্যায়, উৎসবে
যখন কুয়াশা এসেছে গ্রামে, নদীর ওপারে
নাকি খুব বেশি শীত

সময় বদলে যাওয়ার, ইচ্ছার
মৃত্যু নিয়ে এখন আর কি আছে বলার
অন্ধ তারুণ্য এখন ধুঁকছে আলোতে
পাখির ফেরার গান বাতাসেই মরে।

বালির সংসারে

নাম জানলে ডাকতে পারতাম
পুরোনো খাতার মতো একপাশে পড়ে থাকা
দুঃখলিপি কেউতো পড়ে না, যাদের
পোড়ার অসুখ তারা নীরবেই থাকে

নদীর ওপারে যে থাকে
নিঃসঙ্গ শ্যাওড়ার ঝোপ, ওখানেও
গ্রাম ছিল, এখন বাড়ছে শহর
রাতটাও দেরিতে ঘুমায়

যা কিছু পুরোনো বলে
দূরে ফেলে রাখো, হাঁসের কাঙাল ডানা
সেই তোমাকেই ছুঁয়ে যেতে চায়
কে যে কী কারণে হাসে, একপশলা
নদীর ঢেউ বালির সংসারে
এসে নাই হয়ে যায়।

কাচের ঘর

তুমি এই চাঁদটাকে কী করে বুঝবে
কিছু পাখি পাশ ছুঁয়ে
উড়ে গেছে, তুমি অন্ধকারের ভয়ে
কাঁপছো একাই, এভাবে কেউ
বাড়ি খুঁজে পায়

কী করে বোঝাই, চাইলেই
এমনতো নয়, নদীর শান্ত বুক
খুলে দিবে জলের বোতাম, ঢেউগুলো
বন্ধু হবে, ওপারে নিশ্চিত
বাতাসের খিলখিল হাসি
ডাকবে তোমাকে

আমরা কতো সহজেই
ভাগ হয়ে বসে আছি, জানালা
খুলতে ভয়, কাচের ভেতরে ঘর
চারপাশে কোলাহল ঝরা
পাতাদের, পুরোনো কথাইতো শুনি
কী আর করা, ভাসতে
পারি না বলে স্রোতের
পাশেই হাঁটি, উল্টোপথে।

দিন শেষে

যেভাবে পুড়তে বলেছো, কম কি
পুড়েছি, মেঘের বাড়িতে ঘর, ভেসে যাওয়া
একপশলা আকাশ, সবইতো জানো

ঠিকানা হয়নি কোথাও, হয়তো
ভালো জানে পাখি, কিছু খড়কুটো ডালে
ওম দেওয়া সামান্য সময়

একদিন ছানারাও মিশে যায় দূরে
নিঃসঙ্গ হাওয়া, কিছু ধুলা, কিছু পালক
কারো কাছে স্মৃতির মতো

কার কে যে আছে দিন শেষে
দাঁড়ায় পাশে, আমি দেখি বহুদূর একটা
নদী, সেও আর নদী হয়ে নেই।

ভুল

হাজার মাইল বলে যে দূরত্ব তুমি
তৈরি করেছো, একবার বলোতো শুনি
কার কি মুনাফা হয়েছে, আমি
হাঁটতে হাঁটতে দেখি ওপাশে মেঘের
দেশ, এপাশে স্রোত বইছে জলের
মাঝখানে পড়ে আছে ভাঙা ঘর, বেড়া
সীমানা প্রাচীর ছাড়া আর কিছু নেই
যারাই ডাকছে, ফিরে দেখ, তারা
হয়তো বাণিজ্যে এসেছে, তাদের
সামান্যেও লোভ, এতটা বছর ধরে
এই যে ছুটছে সবাই, একবার
খুঁজে দেখো ঘাস, পাতার শরীর
ওখানে লাবণ্য থাকে, তুমি তাকে
কোনোদিন ছুঁয়েছিলে কিনা
আমি না হয় ব্যর্থ হয়েছি, পথ
ভুল ছিল, কিছু ভুল হয়তো
এরকমই, সঙ্গেই থাকে।

জহির হাসান

জন্ম ২১ নভেম্বর ১৯৬৯, যশোর জেলার পাইকদিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে। শৈশব ও কৈশোর কেটেছে যশোর ও ঝিনাইদহের গ্রামে। লেখালেখির শুরু ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে। প্রথম কবিতা প্রকাশ ১৯৮৪ সালে। আগ্রহ ধর্ম, ভাষা, দর্শন ও চিত্রকলায়। পড়াশোনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্রে।

কবিতা : পাখিগুলো মারো নিজ হৃদয়ের টানে (২০০৩), গোস্তের দোকানে (২০০৭), ওশে ভেজা পেঁচা (২০১০), পাতাবাহারের বৃষ্টিদিন (২০১২), খড়কুটো পাশে (২০১৪), আয়না বিষয়ে মুখবন্ধ (২০১৬), আম্মার হাঁসগুলি (২০১৭), বউ কয় দেখি দেখি (২০১৮), বকুলগাছের নিচে তুমি হাসছিলা (২০১৯), আম্মার আরও হাঁস (২০২০), আমি ও জহির (২০২১), রইদের ডাইরি (২০২৩), মেঘ শিশিরের জমানা (২০২৪)।

অনুবাদ : গাজার কবিতা (২০২৪), মোসআব আবু তোহার নির্বাচিত কবিতা ও সাক্ষাৎকার (২০২৫), এমে সেজেরের সাক্ষাৎকার ও আধিপত্যবাদ বিরোধী রচনাসংগ্রহ (২০১১)

সাক্ষাৎকার পুস্তিকা (কবি উৎপলকুমার বসুর সাক্ষাৎকার): কথাবার্তা (২০০৬)

গদ্যগ্রন্থ: জলপাই গাছের রব (২০২১, বিম্ব যেটুকু দেখায় (২০২২)

নিজ চিন্তা ও নিজ ভাষায় গীত গাইলে মোর অন্তর জুড়ায়

আমি গোড়া থাকিই ভাষা প্রশ্নে সোচ্চার ছিলাম। আমি মনে করি চিন্তা ও ভাষা কয়েনের মতো এপিঠ-ওপিঠ। কোনোটা আগে বা পরে না। ভাব ও ভাষা টুইন চাইল্ড। নিজ চিন্তা ও নিজ ভাষায় গীত গাইলে মোর অন্তর জুড়ায়। পরভাষার প্রতি ভক্তি রহে সদা। নিজ মায়ের কথ্য ভাষাই সাহিত্যের কবিতার ভাষা হই উঠা উচিত। এই গীত বহুদিন ধরি গাইতেছি। আর নিজ একটা ভাষারীতি তৈয়ার হইছে এত দিনে যাতে ভালোমতো তোতলাইতে পারি, চিন্তা-ভাবনা করতে পারি, একটা ভাষার ঘর যেন মোর রহে চিরকাল, তা যেন ভাঙি না পড়ে কোনো ঝড়ে। উপনিবেশিত মনোভঙ্গি আমাদের যে ভাষায় কথা কইতে কয় আমরা যেন সেই ভাষায় আমাদের সাহিত্যের সমাধি রচনা না করি।

এ বিষয়টা যেন আমাদের কবি শিল্পীদের ভাষা পরিকল্পনার ভিতর যেন রহে। যে ভাষার ভিতর আমজনতার কণ্ঠস্বর গরহাজির যাতে গতিশীল নদীর আত্মার ঢেউ আছড়ায় পড়ে না, সেই ভাষা সোনায় ঘড়ায় তোলা পানির মতো তাতে একদেড়জন মানুষের তিয়াস মিটায়। কিন্তু আমজনতা যেন তাদের নিজের কণ্ঠের আওয়াজ আমাদের সাহিত্যের ভিতর পায় সেই দিকেই আমাদের ভাষা যেন গড়ায়। আমার কবিতা যেন সেই দেশ মাটি মানুষের গন্ধে ভরা ভাবকথায় আকুল রহে!

সমুদ্রের কবিতা

কত কত ঢেউ চুমাইতে আসে তটেরে।
লাগুড় না পাই
তিয়াসা রহি যায়
তাই কেবলি যায় আর আসে...

আর ঢেউয়ে চুবাই পা
সময়ের অকাল অবসরে
আমরা নিজেরাই বিম্বিত হই তো সমুদ্রের জলে!

দেখি পশ্চিমে
ছায়া আর অন্ধকার মাখা টিলা ছাড়ায়ে
আকাশ আর সমুদ্রের হানিমুন!

কোথায় আমার দেশ সমুদ্র ভাঙনের পর
কোন আনারস বাগানের পাশে ছিল
আমাদের কবর!
কোন বিনিময় প্রথা এইটা!

কোথায় আমার আসল ঠিকানা
কাপতে থাকে
ঠিক যখন ঐ দিগন্ত
আনন্দে সখিসনে আবীর ছড়ায়!

আমরা দেখি আর না দেখি
শো শো বাতাস আসে
দূরে এইসব কিছু কোথাও
ঠিকঠাক জমায় রাখতেছে তো!

বনগাঁ

তখন আমার
একটা সুন্দর লালরঙা ঝুনঝুনি ছিল
আমি বাজাইতাম না!
বাজাইলেই ফুরায়ে যায়
অন্যসব জিনিশের মতো
কোনো একদিন বাজাইব এ নিয়তেই
আমি রাখি দিতাম উঁচা সে লিচু
গাছের মাচান পর। লোভে লোভে
সবাই ওখানে উঠি সেই আমার ঝুনঝুনি বাজাইত।
ওরা কে, আমি নহি!
আসলে তারা তাদের ঝুনঝুনিটাই বাজাইত।
কত বলি কেহই কারো ঝুনঝুনি শত চেষ্টাতেও
বাজাইতে পারে না!
তারা বুঝে না!

পরিভাষাহীন আব্বা একদিন রাগবাগ করি
ভারতে যাওয়ার পথে
বনগাঁয়
ওটারে পুকুরে ফেলিয়া দেয়!
আব্বার কিছু কিছু দিন আমার কাছেই থাকত
সেইবার আমি আব্বা হইতাম আমার গোপনে।

আমি বলি, কাউরে না কয়েই বলি, আমি নিজেই
ঘেউ ঘেউ না করা নীরব সে-এক ঠাণ্ডা পানির স্তরে
রাখতে চায়েছি তারে কোনো একখান
লুকানো মাইয়ের ঘুমের ভিতর!
ঝুনঝুনিটা আমার সবচে সুন্দর
বাজবে বলেই দূরে চলি গিয়া থাকে,
এতদূরে গিয়া
আজো মাত্র বনগাঁয় থাকে!

আমিই ট্রেনের ড্রাইভার ছিলাম

আমি ট্রেনের ড্রাইভার ছিলাম কিনা
বউরে জিগাই
মারে
পারুলরে জিগাই
তারা তো দেখি না-ই বলে
আমি বুঝাই আমি ছিলাম
আমার থাকি অরা আমার বিষয়ে বেশি জানে তো!

ওদেরে সম্মান জানাই
তবু আমি একটা ইটা রঙ ট্রেনের ড্রাইভার ছিলাম
সবাইরে রাজি করাইতে চাইছিলাম আব্বারে
পাঠাই আম্মার কাছে পারুল তুই নিজেই তো
আমার পাশে বসি ছিলি
আমি হরন বাজাইলাম মনে নাই মনে নাই!
কুয়াশা সরতেছিল না তবু
তোরা রাজি হ রাজি হ!
তোদের দেখার বাইরে কি
আমি কিছুই হইতে পারি না!

আমার চুমা

আমার পাগলামির কালে
বেচারা দিকহারা প্রজাপতিগুলারে
আমার দিকে ঠেলি পাঠাইওনা!

শেষে যদি
ওদের রওশন পাখায় চুমা বসায়ে ফেলি
কবুল করি শেষে যদি
আমার চুমার ভারে গোত্তা খাই
তারা চরম মাতাল হই কাতারে কাতারে
ল্যান্ডিং করে সবাই একে একে
আমার খোঁজে নিচে
হিজলগাছের নিচে আসি তারা
হাজার খুজিও পাবে না তারা
আমারে!

ততক্ষণে আমি তো
ঐসব চুমাতেই
খরচ হই গেছি!

নাস্তি

আমি তো ফুটা পাতাও না
কেমনে মাপবো বাতাসের চাপ!

আমি তো মরমি ঘাস না
কেমনে বুঝব সহজ সবুজ!

আমি তো প্রেমিক মজনু না
কেমনে বুঝাব দৈব বিরহ!

আমি তো বটপাতার মর্মর না
কেমনে অস্তিত্বে ফুটাব নৈঃশব্দ!

আমি তো মানুষ না
কেমনে ধরব অসহ নিঃসঙ্গতা!

বউ কয়, দেখি, দেখি

আমি বালিশ পাশে নিয়া বই পড়তেছি।
বউ রান্নাঘর থাকি আমার দিকে
আসতেছে দেখি।
আমি তড়িঘড়ি
বইটারে বালিশের নিচে লুকাই ফেলি।
বউ কয়, দেখি, দেখি,
ভাবে আমি বুঝি ফের কোনো চটি বই পড়া শুরু করছি।

এইভাবে সে জোরাজুরি করে বা।
আমি বা তারে না দেখাই।

কি সেই বই?
সেই আরও আরও খারাপ ভাবিতে থাকে মোরে।
সে চলি যায় আর ভাবে কত কত আমি বা খারাপ!
আমি পড়ি সেই বইয়ের পরের পাতায়:
হযরত কাব (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুকে চিনিতে পারিয়াছে,
দুনিয়ার বিপদাপদ ও বালামুসিবতে ধৈর্য্যধারণ
করা তাহার জন্য অতি সহজ।

এই ভাবে আমি মৃত্যু বিষয়ে
আরসব কিছু গোপন করার অধিকার চর্চা
চিরদিন করিতে থাকি!

আব্বা আপনে আসি কয়ে দেন

সন্ধ্যা নামে
রাত নামে
বিকাল ঝাড়ে ডানা
আমার ভিতর নড়ে চড়ে
দুধ-সাদা বাপের কাফন খানা!

উঠেন আব্বা শিখায়ে দেন
কোন নিয়তে
কোন দোয়াতে
পাবোনে ত্বরা নতুন ভোর!

আব্বা আপনে আসি কয়ে দেন...

আপনে ছাড়া রঙরা সব
বুঝিনি আগে
হয় তামাশা
রংধনুদের কবর!

একটা নরম বিলাই পাবো
এ জগতের শেষে
সেই লালসে নাচি
সে আশেতে
শজারু কোলে করি
নিত্য বসি আছি!

আব্বা আপনে আসি কয়ে দেন...

বুঝলাম কিনা
টেরাই করি
একটু দেখেন
আমরা পোলাপান
বেহুশ কিছু ভ্রম
নিভু নিভু
কাঁদো কাঁদো
অন্তর্ধান
নইলে আমরাও
করবানে ক্রম!

আব্বা আপনে আসি কয়ে দেন...

সন্ধ্যা নামে
লহমা নিড়ায়ে
অখণ্ড একিন
করতেছে ভিড়
জাগতেছে ঐ
যে তিমিরে
ছিলাম আগেই
সেই সে-তিমির!

আব্বা আপনে আসি কয়ে দেন...

আমার আলামত নাই

গোরের মাটির মধ্যে আমারে খুঁইজতে যাইও না-

খুঁইজো, বিলফিরা দুপারে ঝিমানো খড়ের গাদার কাছে হাঁসের মইধ্যে
খুঁইজো, দোয়েল-বসা ডালভাঙা অর্জুন গাছের
কুয়াশার আগেভাগে ভাঙ্গার আগে
খুঁইজো, গরু বান্ধা কিবলামুখী তালগাছটার কালা কালা চামড়ার তলে
পিপড়াগের চলা ফেরার ভিতর
খুঁইজো, ধানের শীষের মধ্যে আটকা পড়া ঠাণ্ডা বৃষ্টি ফোঁটার নিচের দিকে
খুঁইজো, কলার পাতার তল দি তল দি তায়াম্মুমের মাটির যোগ্য মাটির মইধ্যে
খুঁইজো, আইল ঘাসের মধ্যে আটকা পড়া কারো পায়ের শব্দে
ভীত ব্যাঙের বাচ্চার হাঁপানি জিন্দেগিতে
খুঁইজো, দ্বিপ্রহরে পাতাবাহারের গোড়ায় জিরানো মুরগির বাচ্চাদের চুপচাপে
খুঁইজো, শেষ রাতে কানাকুয়ার ডাকগুলিরে তালাক দেওয়ার সময়ে
খুঁইজো, ঘুঘুর গভীর বনের আড়ালে
খুঁইজো, রসুনের খ্যাতে বোনার একটু আগে
খুঁইজো, সাদা কাপড়ের দাদির যোহরের নামাজের সালাম ফিরানোর মধ্যে
খুঁইজো, বোখারী শরীফের ইউসুফের গল্পের ইশারাগুলিতে
খুঁইজো, পাহাড়ে হারানো শেষ পাতিহাঁসের পালকের
পরবর্তী উড়ার সম্ভবনার মইধ্যে

আমারে মোটেও খুঁইজো না
কারণ আমি তো কোনোমতেই কোনোদিনই কেহই ছিলাম না!

জ্যোতি পোদ্দার

জন্ম ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি।
পেশা শিক্ষকতা।

কাব্যগ্রন্থ:
$(a+b)^2$ উঠোনে মৃত প্রদীপ (১৯৯৭), সীতা সংহিতা (১৯৯৯), রিমিক্স মৌয়ালের শব্দঠোঁট (২০০২), ইচ্ছে ডানার গেরুয়া বসন (২০১১), করাতি আমাকে খুঁজছে (২০১৭), দুই পৃথিবীর গ্যালারি (২০১৯)।

বনচালতা

বনচালতার পাতা রঙের শাড়িতে তুমি যেন বনচালতা।
একঝাঁক কমলা হলদে রঙের ফুল টিলার মতো তোমার

খোঁপায় গেঁথে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছো গজারির বনে।
এমন বাকহারা মূর্তি তুমি ঈষৎ বেঁকে কোমরে হাত

রেখে কোথায় যে চোখ রেখেছো তা ঠিক ঠাওর করতে
পারছি না বলে কেবলই ভুল হচ্ছে তুমি কি বনচালতা

নাকি বনচালতাই তুমি এই গজারি বনে বৃক্ষ হয়ে গেলে?
ইচ্ছে করে বনচালতার পাতা থেকে ঝিনুকের খোলস

দিয়ে থকথকে সবুজ আঁচড়ে তুলে ছড়িয়ে দেই এই বন
থেকে বনান্তরে। ফুটিফুটি দুঃখগুলো কমলা হলদে রঙের

বনচালতার ফুলের কম্পনে ঝড় উঠুক বনে-বৃষ্টি হোক
তুমুল-গজারি বনে ঝড়ুক গজারি ফুল গজারি পাতা

আর নিষ্পলক তুমি সবুজ বাতাসে দুলতে দুলতে দেখি
তোমার গা বেয়ে ঝড়ে পড়ছে গারো পাহাড়ের জলধারা।

ছোট ডুবুরি

এতো বড় শহরে এইটুকু জলাধার দেখে তৃষ্ণা মেটে না।
কুরশা বিলের ভারি জলে পা ডুবিয়ে বসে থেকে
ভাসমান কচুরিপানা দেখি।
পাট জাগ দেয়া জলের তীব্র গন্ধের মাদকতায়
আমি দুলে দুলে বেগুনি রঙের কচুরি ফুলকে ডাকি।

মোটা কালো জলে কচুরিপানা ও ফুল জলের তোড়ে
সরে যেতে যেতে ছোট ডুবুরি জলের উপর মাথা তুলে
ঘাড় বেঁকে আমাকে দেখে হলদে ঠোঁটে ডাকল-
আয় আয় জলের ভাঁজে জলের তলে ডুব সাঁতার খেলি।

পাতি সারালি

পায়ের পাতা ডোবা জলের মাটি নরম ও তুলতুলে।
উবু হয়ে জলমাটি হাতে তুলতে না তুলতেই
আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে সবটুকু।

জলমাটি তুলে তুলে স্বচ্ছ জলের বিস্তারকে করে
ফেলেছি ঘোলাটে। উবু হয়ে কতবার এই আল বাঁধা
জলে হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে করেছি ক্রমশ ঘোলা

জলের এক অপরিচ্ছন্ন মানুষ। পাতি সরালি তখন
আলে বসে পাখনার ভেতর মুখ গুঁজে খুঁজছে
নিজস্ব ওম। আমাকে দেখেই বুঝি জল থেকে
উঠে গেলো পাতি সরালি দম্পতি? বাদামি রঙের পশম
বাতাসে উড়তে দেখে তাকাতে দেখি ছোট্ট পাতি সরালি
মা-সরালির দুই পায়ের ফাঁকে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

কেঁচো গিলে খেতে খেতে আমাকে দেখছে ভয় আর
বিস্ময়ে। ইচ্ছে করছে জল ও মাটি তোলার মতো করে
উবু হয়ে পশমীর মতো ছোট্ট পাতি সরালিকে

কোলে তুলে নেই-হাতের আঁজলায় তুলে সোহাগ করি।
আমার কোষ্ঠী ভালো না। পায়ের পাতা ডোবা জলে শুধু
নয় যেখানেই নামি স্বচ্ছ জল ঘোল ও ঘোলাটে হয়ে পড়ে।

চড়াই

তিনি এলেন।

দুলে উঠল ডাল।
কয়েকটি পাতা ছিল গতকালও।

অস্থির তিনি এদিক ওদিক তাকিয়ে পালকে
মুখ ঘষতে লাগলেন-আমাকে দেখে সরে বসলেন।
আবার দুলে উঠল পাতাহীন ডাল-
শুকিয়ে গেছে রোদের দাপটে।

কালচে রঙের কঙ্কালসার হাতের মতো
বাঁকানো হাতে ক'দিন আগেও পাতার পাশে পাতা ছিল।
আর ছিল চড়াইদের ক্যাচম্যাচ।

উঠানে রোদে মেলে দেওয়া মুগে একটু ঠোঁট ছুঁয়েই
খুব নিম্নস্বরে শিস বাজানোর মতো ধ্বনি তুলে
তিনি উড়ে গেলেন পড়শীর উঠানে যজ্ঞ ডুমুরের ডালে।

না-পাখি

আতা গাছের বাবড়ি দুলানো পাতার ঝোপে আতাকে
খুঁজতে গিয়েই চোখে পড়ল লালচে হলুদ ডেউয়ার
মতো রঙের এক পাখি পাতার ফাঁকে ফাঁকে
উড়তে উড়তে বসছে আবার বসতে বসতে উড়ছে।

ছোট্ট চোখে ভয় আর মনখারাপ বাসা বেঁধেছে বলে
কোনো ডালেই বসতে পারছে না।
নখের আঁচড়ে ডাল আঁকড়ে ধরলেও হড়কে যাচ্ছে;
পাখনা ঝাপ্টাচ্ছে আর পাশের ডালে উড়ে বসছে।

যে ডালেই যাচ্ছে পাতার ফাঁকফোকর দিয়ে
একবার দুইবার করে ভয় আর বিস্ময় চোখে
ঝুঁকে দেখছে একজন না-পাখি আতা গাছে
কী যেন খুঁজছে।

ভূঁই আমলা গুল্ম

এখানকার পাহাড় ন্যাড়া পাহাড়-সবুজের ছাট এখানে
সেখানে থাকলেও রোদের খরতাপে দৌড়ে নেমে
এলাম পাহাড়ের পাশের বাড়ি টিলার খাদে।
এখানকার রোদ গায়ে মাখা শুশ্রূষার রোদ।
এখানকার রোদ আদর ও আবদারের রোদ।
এখানকার রোদ ছায়ার অধিক আতাগাছের নীচে কুয়াতলা।
এখানকার রোদ সেতারের তারের মতো ম্যাজিক ও মিউজিক।

আমি এই মিউজিক শুনতে শুনতে একদিন এইখানে
শুয়ে পড়েছিলাম চিরল পাতার ভুঁই আমলা গুল্মের তলে।

ইচ্ছেফুল

আমাদের গল্পগুলো ইচ্ছেফুল রোদকণা দিয়ে ঘেরা।
আমাদের গল্পগুলো তপ্ত কড়াইয়ে ফোটা সাদা সাদা খই।

আমাদের গল্পগুলো ছড়ানো জড়ানো লতা
ফুল ফুটে ফুল ঝরে কলি ফুটে ফুল ফুটে ফুল ঝরে...

আমাদের গল্পগুলো জলে ভাসা জলে ডোবা
জলের সাথে চলতে চলতে নদীর বাঁকের মুখে হারিয়ে যাওয়া।

আমাদের গল্পগুলো সাঁজি ভরা একদল ফুল
কোনটা খোপায় উঠে কোনটা তুলশী তলায় আলো জ্বলা

সন্ধ্যাতারা অন্ধকারে মেলে পাঁচ পাপড়ির গোলাপি পাখা।
কোনটা টেবিলে বসে ফুলদানি খুঁজে-কোনটা কেবলই অতিরিক্ত।

আয়না-পুকুর সমাচার

ক

জলে কোনো ভাঁজ নেই-এক্কেবারে আয়নার মতো আয়না-পুকুর।
মেঘও উড়তে উড়তে পেঁজা তুলোর সজ্জা পরিপাটি আছে কিনা
দেখবার ছলে স্থীর হয়ে আছে আয়না-পুকুরের উপর।

ছিপ নিয়ে বসে আছি।
ইচ্ছে হয় ভেঙে দেই জলতরঙ্গ।

এমন উদাসীন পুকুর আমি অনেক দিন দেখিনি।
ইচ্ছে হয় জলে নামি-ডুব সাঁতারে তছনছ করি জলের বিছানা।

খ

হঠাৎ বেখাপ্পা ঝিরিঝিরি বৃষ্টি ভেঙে দিলো সব।
ছোট ছোট বৃত্তঢেউ ভেঙে ভেঙে পুকুরের পাড়
ছুঁয়ে ছুঁয়ে আবার গলিয়ে পড়ছে জলের ভেতর।
বৃষ্টি আর বাতাসের হল্কায় কাঁপছি আমি
                আমার ছিপ আর ছোট ছোট ঢেউবৃত্ত;
আর একটা বগা ফকফকা সাদা পাখনা মেলে
জলের শরীরে হেঁটে হেঁটে খুঁজছে পুঁটি মাছ।
আহা! রূপালি রঙের পুঁটি মাছ।
ডোবা তেলে মুচমুচে ভাজা গোলচোখের পুঁটিমাছ।

জলের শরীরে বৃষ্টির নাচনে শত শত হাজার
                হাজার ফুটে উঠছে গোলাকার জলফুল।
ইচ্ছে হয় জলফুল আঁজলা ভরে তুলি।
ইচ্ছে হয় গাঁথি জলফুলের মালা।

আমি একাকী ধীবর ছাওয়াল পুকুরে পুকুরে ছিপ
                ফেলে তাকিয়ে থাকি ফাতনার দিকে;
কার লাগি গাঁথব জলফুলের মালা
কে রাঁধিবে রূপালি রঙের ছোট ছোট পুঁটি মাছের ঝোল?

গ

এবার বর্ষা দেরি করে এলেও পুকুরের কোল ঘেঁষে
                গড়ে উঠেছে হেচি শাক পুদিনা পাতা
আর গোল গোল কয়েনের মতো থানকুনি
পাতার কলোনি-এক্কেবারে সবুজের সমারোহ।

যখন রোদের ছটা চারদিকে উপচে পড়ে
এই সবুজের এমব্রয়ডারি করা আয়না-পুকুর
দেখতে কী যে ভালো লাগে!
কী যে ভালো লাগে!

তুমি নেই বলে এই চরাচর এই কম্পিত সবুজ
অব্যক্তই রয়ে গেলো গোটানো শামুকের মতো।

ধীবর আমি কেবলই গোপন সৌন্দর্যে ডুবে
পুকুরে ছাপিয়ে পড়া ব্যাঙের ঝপাং ঝপাং
শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি আয়না-পুকুর ঘাটে।

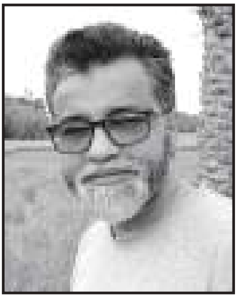

কাজী নাসির মামুন

জন্ম ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩। বসবাস ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায়। পেশা শিক্ষকতা। নাটক দিয়ে শুরু। নব্বইয়ের শুরুর দিকে নাটকের পাশাপাশি গল্প লিখা শুরু। শূন্য দশকের শুরুতে কবিতাই মুখ্য হয়ে ওঠে। সম্পাদনা করেন ছোটকাগজ মেইনরোড। কাব্যগ্রন্থ: লখিন্দরের গান (২০০৬), অশ্রুপার্বণ (২০১১), কাক তার ভোরের কোকিল (২০১৭), রোহিঙ্গাপুস্তকে আত্মহত্যা লেখা নেই (২০১৮), মুহূর্তগুলো তরবারি (২০২২), রাষ্ট্রনৈতিক সনেটগুচ্ছ (২০২৫)

রাষ্ট্রনৈতিক সনেটগুচ্ছ

২৩

এসেছে বেদনাবাহী চেটে-খাওয়া সময়ের ঘাত।
ত্রাহি ত্রাহি জীবন ছেয়েছে আজো মনের বিদ্রোহ
কে পারে ডিঙিয়ে যাবে ভবলোকে মৃত্যু, অবরোহ?
জান্তব যুক্তির বলে ক্ষমতাও দ্রোহে কুপোকাত;
মানুষ মাড়িয়ে গেলে ন্যারেটিভ শাখের করাত–
দু'ধারেই কাটে; তবু ইতিহাস অনন্ত নির্মোহ;
সত্য-সঞ্চালিত চোখে ফেলানির লাশ যেন গ্রহ–
কাঁটাতারে ঝুলন্ত আলোয় লেখা 'ভারত নিপাত'।

মুক্তি ও যুদ্ধের দিনে কে ফেরায় সহযোগী দেশ?
ফেরাতে পারি নি বলে করদ রাজ্যের মতো প্রেম
তুমি কি বিলাবে সখি পরদেশে? অনড়, অশেষ?
বিপ্লব গুঁড়িয়ে দেবে চিরচেনা ট্যাবু ও টোটেম।
তোমাকে তাড়িয়ে ফেরে গণমুখী রক্তাক্ত চব্বিশ
মুক্তিযুদ্ধ রাখালিয়া; একাত্তর শিস দেয়, শিস।

২৪

শিস দিলে ঘুম ভেঙে মুক্তিযুদ্ধ গন্ধস্পর্শময়।
ব্যথিত গোলাপ যেন স্বাধীনতা, ফুলের নির্যাসে
অশ্রুর অকুণ্ঠ পুঁজি; রাজনীতি ফলে চাষবাসে।
স্বজাতি পণ্যের মতো পুষ্পমূল্যে বেচাকেনা হয়
তোমার বেহাল মনে গুম, খুন বিরূপতা নয়
নির্মম আয়নাঘরে লাল হাত মুছে ফেলো ঘাসে
বিপুল পাচারকৃত টাকাকড়ি অকথ্য সন্ত্রাসে
রাষ্ট্রকে দোলায় শুধু; কেড়ে নেয় তোমার আশ্রয়।

নখর আড়াল করে তুমি এক ফেরারি ময়ূর
জাগ্রত মানুষ দেখে ভেবেছিলে সাপের মিছিল
বিজয়ী চব্বিশ এলে একাত্তর ফিরে পায় সুর
উদিত সূর্যর দিনে তুমি কেন এঁটে আছো খিল?
জীবন বিদীর্ণ করে যতটুকু রক্ত ফেলে যাই
মহাকাল ফেরি করে বিপ্লবের নতুন সদাই।

পাতার প্রলাপ

পৌর গোরস্থানে মৃত শেয়ালের পাশে
ব্যাপ্ত চরাচর নিয়ে বসে আছি; একা।
উদ্বুদ্ধ সকাল নম্র রোদের সোনালি দেহ
আমার পায়ের কাছে মেলে দিলে
সূর্যকে ভাবতে শিখি আলোর দালাল।
দূরে পুষ্পকঙ্কাল, মলিন ধুলা শরীরে মেখে
ললিত সৌরভ-স্মৃতি ভুলে যেতে থাকে।
হয়তো প্রেমিক তার আনত প্রেমের
ভূলুণ্ঠিত প্রতিদান মাটির সান্নিধ্যে ফেলে গেছে।
কত ভুল, পাপের নিয়তি, তীব্র তর্কের করাত
কবরের মাটির ভদ্রতা বুকে নিয়ে
একদিন নত হয়; বিচ্ছিন্ন বনের কাছে
পাখির সম্পর্ক খোঁজে। বস্তুত সম্পর্ক এক জটিল পুরাণ।
মানুষ গল্পের ক্রীড়নক হয়ে ব্যর্থতার করাল সত্যকে
একদিন নিজের সঙ্কটে বুঝে ফেলে;
দেখে, কেউ তার সঙ্গে নেই।
দেহের পুরনো ছাল ফেলে
যেভাবে পালায় সাপ, সেরকম

অধীর নিস্তার চেয়ে সবাই পালায়।
স্মৃতিবিষ বুকে নিয়ে
আগুনে আগুনে পুড়ি আমরা সবাই একা একা।

মানুষের শ্রমে আজ উৎকীর্ণ সকাল।
মায়াবী গরুর চোখে পৃথিবীর সব মধু বোবা হয়ে আছে।
আমূল সাধনাগুলো চুপচাপ হয়;
কত মর্ম-আলাপন গভীর সঙ্কেতে
নিজের জীবনে জমা রাখে
নিঃসঙ্গ বধির।
একটা বিড়াল হাঁটে; তার ভয় চতুর পুলকসহ
পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে দেখি।
জীবনের লাস্য ঘিরে বহুদিন
মাতাল বাসনা ছিল আমারও; ভেবেছি
লোমশ আদর পেলে
একটা বিড়াল হব নারীর মুঠোয়।
চুপি চুপি টিকে র'বে জান্তব যৌনতা
দুর্বিনীত আমাদের সকল খেলায়।
আজ আমি সঙ্গপ্রিয়; জনতার নিষ্ফল মস্তকে
চমকের মতো মিশে আছি।
পলে পলে সাজানো সকল সংক্রমণে
গ্রীষ্মের মুগ্ধতা দেখি; আর দেখি গোপন শূন্যতাগুলো
ঘুমন্ত খরগোশের পরাজয়ে জেগেছে হঠাৎ।
কারো কারো জীবন তো বিজয়ী কচ্ছপ।

বিষণ্ন মর্মরে ঝিরিঝিরি হাওয়া-গান
আমার শরীর ছুঁয়ে গেলে
কেন যে পাতার কথা মনে পড়ে আজ!
পাতা এক নিবিড় সবুজ হাহাকার।
বিভোর বাতাসে নড়ে; তবু
চকিতে পাখির মতো উড়তে পারে না।
ডালে ডালে তার শোক, হলুদ বেদনাগুলো
গাছের স্পন্দনে টিকে থাকে;
মড়কে মড়কে শেষ হয়। আহা পাতা!
নিঝুম মৃত্যুর দিকে আমাকেও সঙ্গে নিও।
সবুজ প্রলেপ নিয়ে ঝরে যেতে
আমি এক পাতা হতে চাই।

নীরবতা কবরের স্পর্ধা।
উদগ্র পোকার চলাফেরা, নীল মাছি
হরিৎ গুল্মের নিচে
সামান্য মলিন ছায়া– সবকিছু মহাকাল;
তুমুল স্খলন যেন; আরেক ভঙ্গুর কোলাহলে
পরম শান্তির দিকে নষ্ট হতে চায়।
ভাষা হয়ে ফোটে।
প্রজাপতি রঙিন ডানায় লিখে নিজের পতন।
তবু পাতা, তোমার তরঙ্গ আছে স্পর্ধিত মৃত্যুর।
নির্ঝর বেদনা আছে; বিরল মমতা এক বোঁটায় বোঁটায়।
আমি হাতে নিই; আহা! রিনি রিনি তোমার শরীর
স্পন্দিত বুকের মধ্যে তিলে তিলে গড়ে তোলে আমার সাহস।
স্ত্রী-পুত্র, বিবিধ সঙ্গ, আরো দূর ফলনবেষ্টিত স্বজনের
মুখর সত্যকে মানি; তবু
সুকণ্ঠী বন্ধুর গান, প্রেমিকা পসার
আকুল স্তনের দিকে ধাবমান সকল সুখের মেদ, আর
নম্র চুম্বনের আশা দুলতে দুলতে
ঠোঁটের ওপর
যদি কোনোদিন ক্লান্তি বয়ে আনে
আমি খুব একা হতে পারি।
কখনো চন্দনকাঠ অগ্নিদগ্ধ হলে
মানুষ পোড়ার আগে বিগলিত হই।
কাঁদি একা একা।

স্পর্শক্ষয় ও আমাদের দিনকাল

প্রেমের ভুলের দিকে যেতে যেতে
আমি যেন কষ্টার্জিত টাকা।
হঠাৎ খরচ হলে দুঃখ পাই,
তবু নিরুপায় থাকি।
কে আমাকে অপচয় করে, কে সে?
একটা ধারালো ছুরি শ্বাপদ সম্পর্কে
আমাদের পাশাপাশি গুম করে রাখা।
গুপ্ত জলে বিষ দেয়
আত্মার গহিনে বসা নিরূপিত হাত।

তবু স্মৃতিসমুদ্রে মানুষ ছাড়া
আর কোনো ঢেউ নেই জাগিয়ে তোলার।
জীবনের সব ঘূর্ণিব্যাপী
কেবল মানুষ গুঞ্জরিত মনে মনে।
ইচ্ছে করে ফকিরগঞ্জের
টুপটাপ মানুষের ভিড়ে
ঝিমঝিম বৃষ্টির কয়েক ফোঁটা হয়ে বসে থাকি।
আলির দোকানে বসে চা খাই; সরের
শ্যাওলা ওখানে ভাসে দুধের কারণে সাদা সাদা।
জীবনের সকল চুমুক
এইভাবে মধুময়,
    নিশ্চিন্ত সরল হতে পারে।
ঘরের বিরহে তার আরাধনা করি।
ওসমান, সেই নম্র মুখরতা
পাখির চঞ্চুতে যাকে খাবার ভাবতে ভালো লাগে
আসবে কি? বলবে, বেরোন।
                    আপনেরে মিস করি।
বকুলের গল্পগুলো দুমড়ানো
কাগজের ব্যথা নিয়ে সামনে দাঁড়ায়।
বলেঃ আলো দেন। আমি বলিঃ লগ্ন হোক।
এই নভো অন্ধকার আমাদের নিজস্ব খরিদ।
একদিন বিক্রি হবে। আজ হোক একাকিত্ব বরণ।
বকুল একটা অভিমানী জল। চুইয়ে পড়ছে।
যার স্পর্শ আমার কান্নার মর্মমধু, বলীয়ান।
কচুবনে টলটলে পানি
কত ক্ষোভে টুপ করে ঝরে;
আমি ধরি। ভাবি, ওটা কেউ না, রতন।
                  সে আমার স্নিগ্ধতার ভাই।
ওকে আঁজলায় নিয়ে মুখ ধুই।
আশ্চর্য ক্ষরণ থেকে কত পাখি
এইভাবে উড়ে উড়ে পালক ঝরায়।
দহন-মলিন ঘরে বসে
        আমি
        মরা পালকের জানাযা পড়াই।

ঘরভর্তি গান

পালক পতন মানে। ক্ষরণ সত্তার
নিবেদিত ডানা, ঝরবেই।
আজ স্পর্শক্ষয়, দূরে মনুষ্য প্রান্তরে
মুছে গেছে সবুজ প্রীতির কোলাকুলি।
চরাচরে হাঁচির শব্দের ভূত-ভয়।
তবু নভোবন
মেঘের নিঃশ্বাসে
পৃথিবীতে নাম লিখে স্মরণ-বৃষ্টির।
মুখ মনে পড়ে। ভেজা ভেজা মুখ।
নিজের হাতের সঙ্গে
নিজের বৈরিতা, অবিশ্বাস।
যেন গুপ্তঘাত এক বিষের প্রলেপ
মাখিয়ে রেখেছি নিজে নিজে।
আমার আত্মার নিরাময়ঘন
ওইসব মুখের উদ্যানে জলগন্ধে
ধুয়ে যেতে থাকি। ভাবি,
আমি এক আদিম উদ্ভিদ। গুল্মলতা পরিচয়।
লতিয়ে উঠতে চাই গহনে গহনে চিরকাল।

ধূম্রল কুহক থেকে দূরে
মির্জা মান্নানের বাড়ি। বাড়ির উঠানে
সঙ্গরত পাখির ভুবন। কমলার
নরম পাতায় সূর্য দরদ ঢালছে।
যতদূর চোখ যায় ফসলের সবুজ স্বরাজ
দিগন্তের গীতল পশ্চিমে
উবু হয়ে আছে। যেন নামাজ পড়ছে।
দূর থেকে দেখা যায় গাছের তাওয়াফ।
মাঝে ওর ঘর। ঘরভর্তি গান।
যে গান লুকিয়ে রাখে পাখি
নিঝুম নীড়ের বুকে
একাকার সুরের পাতায়।

মানুষ মূলত গাছ; শূন্য বেয়ে ওঠে।
মৃত্যুবীজ পুঁতে রাখে জন্মের সময়।
মন হলো ডালপালা;

আকাশ অবধি
    যার আঁকুপাঁকু।
বড়জোর মেঘ দেখে;
বৃষ্টির নিকুঞ্জে মুখ ধোয়।
দূরের গ্রহের বুকে মাথা রেখে
ঘুমাতে পারে না।
পায়ের শেকড় এসে মানুষ জড়ায়।
ওইখানে সুখ;
হৃদয় প্রস্তুত হাতে হাতে।
আজ মির্জা মান্নান হাঁসের মাংস খেতে
ডাক দেয়। হৃদয়ের বাড়া ভাতে
ভালোবাসা ফেরাতে পারি না।
জাগ্রত আত্মার দিকে
লুফে নিই সকল দাওয়াত।
ওর বউ পরিবেশনার
অন্তঃস্থ বিদ্যায় গান ঢালে;
গানের শরীরে
পাখির প্রহর আমি খাই।

ভালোবাসা নিজেই খাদক।
তার পেটে হজম হয়েছি বারবার।

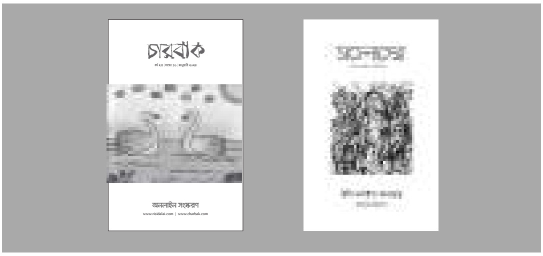

www.risidalai.com
www.charbak.com

মালেকুল হক

জন্ম ২৫ আগস্ট সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক থানাধীন ঐতিহ্যবাহী মঈনপুর।

কাব্যগ্রন্থ: সমুদ্রগণিকা এবং হাওয়ার বাঁশি (২০০৮), বিনয়গুচ্ছ (২০০৮), Echo The Pillars Of Nothingness (২০১৫), Divine Cross Beneath The Gloomy Evening (২০১৫), দিব্যোন্মাদ আয়না (২০১৭), তসবি ও রক্তবিন্দু (২০১৭)।

অধরার অন্বেষা

কবিতা কখনও শেষ হয় না, কেবল থেমে যায়। এই থেমে যাওয়ার মধ্যেই বলে ওঠে যা অসম্পূর্ণ তা অধরা। কবিতা যেন সেই অস্তিত্ব, যার অন্তঃস্থিতি গঠিত হয় অনুপস্থিতির কাঠামো দিয়ে। এ অর্থে কবিতা কোনও সত্তার গীত নয়, অসত্তার অনুরণন। মার্টিন হাইডেগারের মতে ভাষা সত্তার গৃহ হলেও কবিতার ভাষা সেই গৃহ যেখানে প্রতিটি ইট তার অস্তিত্ব হারায়, আবার প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে শব্দের মতো, কখনও উপস্থিত নয় কেবল বিলম্বিত, চিহ্নায়নের আগেই পিছলে যাওয়া, প্রতিশ্রুত সম্ভাবনা মাত্র। আত্মজীবনীর মতো কবিতাও কখনও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ধারণ করতে পারে না; উলটো, দুটোই জাক লাকার 'mirror stage'-এর মতন প্রতিফলিত প্রতিচ্ছবি যা প্রকৃত 'আমি' নয়, বরং গঠিত প্রতিমান। কবিতা আত্মজৈবনিক না হয়ে বরং আত্মভ্রষ্ট, জাক দেরিদার trace-এর মতো এক অদৃশ্য ছাপ বা অনুপস্থিতির সাক্ষ্য দিয়ে চলে যায়। কবিতার এই অসম্পূর্ণতা মূলত তার নীরবতাকে ভাষা করে তোলার ক্ষমতায় নিহিত। থিওডর ডব্লিউ এডর্ন বলেন, অশউইৎজের (Auschwitz) পর কবিতা লেখা বর্বরতা', তখন আমরা বুঝি কবিতা সবসময়ই কঠিন ভাঙন, এক linguistic barbarism, যা নিজের ব্যাকরণকেও অস্বীকার করে। ভিটগেনস্টাইনের 'যার কথা বলা যায় না, তা নিয়ে চুপ থাকতে হয়'–এই নীতিতে কবিতা তার নৈঃশব্দকেই চিত্রকল্প, ছন্দ ও ব্যঞ্জনায় রূপ দেয় তার সৌন্দর্য, তার অসম্পূর্ণতায়। কারণ, পূর্ণতা মানেই মৃত্যুর সমান আর কবিতা তো এক চিরস্থায়ী উন্মুক্তি–শেষ না দেখেও যে আমাদের অনুভব করে। কবির আনন্দ এই অধরার সীমায়, যেখানে কবিতা ধরা দেওয়ার আগেই পিছিয়ে যায় যেন তাকে চুমু খাওয়া যায় না, কেবল নিশ্বাস টের পাওয়া যায়–সেই অনির্ণেয়তার

মধ্যেই ডেরিডিয়ান অ্যাপোরিয়া (Derridean aporia)-র মতো কবি খুঁজে পান তৃপ্তি, যেখানে কোনও সমাধান নেই, কেবল সিদ্ধান্তহীনতার এক অনুচ্চারিত গভীরতা। জঁ বোদ্রিয়ার বলেন 'The real is that which always escapes representation', কবিতাও সত্যকে নয় তার ছায়াকে উপস্থাপন করে। Aristotelian metaphysics যেখানে 'সত্তা কী' তা নির্ধারণে ব্যস্ত, কবিতার metaphysics সেখানে সত্তাহীনতার ব্যাকরণ নির্মাণ একপ্রকার সত্তাতত্ত্বীয় ত্রুটি (ontological defect)। যা পাঠকের হৃদয়ে প্রতিধ্বনি তোলে এবং নিজেকে সম্পূর্ণ করতে চায় না। জাক দেরিদার মতে কবিতাও প্রতিটি পাঠকে ভেঙে আবার নতুনভাবে পাঠযোগ্য করে তোলে—সে পাঠ নির্ভরশীল পাঠকের উপর, আর তা-ই সে অনন্ত পুনর্গঠনযোগ্য। সময়ের গণ্ডিতেও কবিতা নিজেকে বেঁধে রাখে না—সে বর্তমান থেকে অতীতের চিহ্ন টানে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিকে চোখ রাখে, এ যেন হেনরি বার্গসনের durée অর্থাৎ জীবিত সময়ের ধারায় সে অবস্থান নেয়। তার সময় বৃত্তাকার, প্রতিধ্বনিময়, যেখানে একটি অনুচ্চারিত শব্দ রূপ পালটে ফিরে ফিরে আসে। অধরাকে ধরার চেষ্টা মানেই ক্ষমতাবিরোধিতা, কবি সেখানে নৈতিক বিপ্লবী; কবি ভাষার আধুনিক সরলীকরণকে অস্বীকার করে ভাষাকে এমন অরাজক ক্ষেত্র করে তোলেন যেখানে শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে, অর্থ নিঃসরণ হয়, শূন্যতা হয়ে ওঠে সৃষ্টি। অতএব কবিতা সেই অনুরণন যা কখনও স্পষ্ট নয়, অথচ হৃদয়ে বাজে। এটি জ্ঞানতাত্ত্বিক সংকটও বটে, যেহেতু আমরা জানি না কবিতা কী, তবু জানি সে আছে। কবিতা লেখা নয়, একপ্রকার অস্তিত্বচর্চা—সত্তাগত অনুশীলন, যেখানে অধরাকে ধরার চেষ্টাই হয়ে ওঠে কবিত্ব এবং অসম্পূর্ণতাই হয়ে ওঠে কবির পরম তৃপ্তি।

সংকেত-পাঠ

এইসব সঙ্কেতে প্রেমের কথা কয় কে হেথায়?—
য্যান শূন্য পোস্ট-অফিসে পইড়া থাকে আদিখ্যেতা।
খামে নাই ঠিকানা, তবু চিঠি খোলে কেউ কি কভু?
যাইতে যাইতে দেখি সে শিউলি ফুল গোণে বাতায়।
ভেবেছিলাম আমি বুঝি পারম্পর্যের প্রত্যুত্তর
সে হঠাৎ বলে, 'তুই তো জানস না আমি কোন সত্তা!'
একচালা পাটাতনে আমি য্যান শুয়ে রই নিরুত্তর—
তার হাতে ছুরি, মুখে আদুরে হাসির ইশারা।
কী কই তাকে? কইলে সে কয়, 'এই তো তোর হিসাব!'
না কইলে কয়, 'তুই তো সেই বোবা, চেনা ভূত!'
হিসাবের বাইরের আমি, তবুও সে চায় উত্তাপ।
তখন ভাবি, দ্যাশ ছাড়ি, নিয়া তার কান্নার ঘুঁট—
কোন ঘন আন্ধারে একলা ভাঙি সংকেতের চাপ।

তরলা

সেই ভরগাঙ বেয়ে চলতেছিল তরলার পাট
কোন্‌খান থিকা যে এলি, কোনখানেই নাই তো ঠিক
চোখের পানি নাকি খ্যাপা জোয়ারে হয় বর্ণচোরিক
তর ডাগর চাউনি কেমন আঘাত করে হাপাত;
ডুবার আগে তুই কইলি, ‘আমি জলের ভোজপাত’
মুই তন্নতন্ন খুঁজি–তুই তো হবি না ঘূর্ণির ছিক!
তবু বুকে তোর নামে উঠি দুঃস্বপ্নের হাইবাতিক
ধরো যদি দেখো–মই তর থোড়-বাড়ি তর চাট;
তরলা, এই প্রেম নাকি ছানার খাটে পুরান ক্ষুধা
তুই পিঁয়াজ কাটিস আর আমি জাই ছিঁড়ছি চোখ
তর হাফজোড়া পায়ে গজাল–ও মাটির কী বোক্‌
তবু খ্যাতে আবারও চাষ দিম প্রেমের মিথ্যা দুধা
তর কামনার আগুনে পোড়ে জোনাকির মুখ
তরলার নাম ধরি–তবু নাই তো তার সুখ।

সাদার দূতাবাস

তোর সাজপোশাকে কীসের ইশারা ছিল বল্‌ না
একখান সরস্বতীর ছবি তুই দিয়েছিলি দূরের সিংহাসনে
চন্দন মুছা গিয়া গায়ে পড়াইছিস দুধের মতো রং
নাগিনীর দুধ খাওয়া মুখ, ফর্সা হইলে হয় মা
তোর মুখের ওই সাদা চামড়া দিয়া ঘর বানায় তারা
জানলা নাই, দরজা নাই–আয়না থুইয়া বাস করে।
বাঙালি রমণী তোর ঠোঁট কই, আজ শুধু প্রসাধনী
একটুখান চুন দিলে জোছনা উঠে গালে, গলায়।
রান্না ঘরের ছাই কই, আজ খালি পাউডার ছিটানো
সাজের এইত শক্তি–মুখ থাইকা ইতিহাস মুছে ফেলে
তোর যেই সময় লাগে মুখটা ফর্সা করনে
সেই সময় দিয়া চাঁদের পিঠ ছুঁইয়া ফেরা যায় স্বপ্নে
তুই সাজছিস ঠিকই, কিন্তু মুখে নাই আগুনের রেখা–
সরস্বতীর চোখে আজ নীল নয় বরং সাদা পলক।

উলট-পালট

আঙুলের নিচে চাপা পড়ে যায় নিঃশ্বাসের হাওয়া
যেমন ঘুমের ভিতর বান ডাকে ভেসে যাওয়া;
তুমিও ছিলা, না ছিলা, থাহা যায় না কতদূর–
ধরা যায়, ধরা যায় না, আবারও পুরান ছাওয়া।
রক্তের নিচে বাজে এক বিরামহীন কাঁসার সুর
আমি শুনি, না শুনি, তবুও তোমার নাম ডাকি
চাঁদের কপালে যে ছোপ, তা কি আমার চিঠি?
তুই কি আমারে ভুলছিস, না আমি নিজেই ফাঁকি?
বুকের কড়ানাড়া মাপে বালুভরা পালঙ্ক রাত
তাহার নিচে গোপন তোর ছায়া নাকি সন্দেহ?
কোন পলকের গোপনে বাজে অরূপ বাতাসের বাঁশি
আরও ভেসে যাই আমি, না তুই–উলটোই প্রতিনিয়ত;
আয়না থাইকা যেন ঝরে পড়ে ঘুমচোখা চেতা ব্যথা
আমি আছি তো, না নাই, আবারও জেগে উঠি বিপরীত।

প্রেমানুগত্যে নয়, নয়া অভিসারে

চুম্বনে সায় নেই, আমি দেহ-আচারের অতল পাঞ্জেরি
তুমি পিতৃতন্ত্রের ঠোঁটে যেই লিপস্টিক রেখেছিলে
তা আমার পায়ের তলায়, রং হয়ে গিয়েছে ধূলি।
আমি ঠোঁটে রাখি না পবিত্রতা, রাখি না প্রতিশ্রুতি–
রাখি তোমার নাম-ছাড়া ভাষা যা গলে যায় চুমোয়।

তুমি রাজা ছিলে, আমি খোলা শরীরের প্রান্তবাসী
আমার ঘ্রাণে কুরবানি নেই
তবু তোমার সভাঘরে আমার নাভির গন্ধ ভেসে আসে।
তোমার একপাল অশ্ব আমার বাহুর রেখায় দুলেছে
তোমার শিরস্ত্রাণ খুলে নিয়েছে আমার স্তনের ছায়া।
তবু প্রেম বলো না, তুমি।
প্রেম তোমার ছকে বাঁধা দরবারি অভিসার,
আর আমি, আমি বরং কাদায় লুটানো এক ঈর্ষাকাতর অলীক নদী।

আমরা মিলিত হলে
জগতের সব পতাকা ছিঁড়ে ফেলি
শুধু একটি চুম্বনের জন্য
যার রক্তমাখা দাঁতে আমি লিখে রাখি–
আমার শরীর কোনো সাম্রাজ্য নয়।

তুমি আত্মার দরজায় দাঁড়াও

তুমি কি দাঁড়াইছ মোর আত্মার পাটাতানে–
য্যান কোনো ক্লোরোফর্মে ঢোকা গোপন রাষ্ট্র-গন্ধ?
তুমি য্যান বোমা না, তবু একটা পরিত্যক্ত বিমানঘর
যার কেবলি অশরীর আগুনে মাটির দেয়াল জ্বলে।
আমারে তুমি চাও না, তাও তৃষ্ণায় ফাটে বুক
আমার ওই পুরান গতর, যেখান আড়াল থাকে রাষ্ট্র দ্বন্দ্ব।
তুমি ভালোবাসা না, তুমি অতীতের প্রেত-খবর
চিরতরে 'না'-তে আটকে থাকা আমার হ্যাঁ-র ছলে।
তুমি কি সত্যি চাও? নাকি ওসব ড্রোনের ছবি–
আত্মা বিঁধে ফেলো ক্যামেরার অন্ধ রশ্মিতলে?
তুমি কি একদিন দেখবা, আমি কোথায় বাসি?
আমার ঠোঁট ভেঙে নাম পড়ে রক্তে 'প্রিয়' শব্দ–
কিন্তু জানবা না তাও, এই প্রেমের রাজ্যেই আসি
যেখানে শুধু হারাই, যেইখানে 'পাওয়া' মানে ক্ষত।

তুমি কই যাও প্রেমের ঘড়ি লইয়া

তুমি কই যাও প্রেমের ঘড়ি লইয়া,
পেণ্ডুলামের পায়ের তলে সময়ের নাগর বাজে,
আঁধারেও যে কানে কানে বলে–আর পারি না রে
এবার থামি, ঘড়ির কাঁটা দিয়া প্রেম মাপা যায় না।

তুমি কি ঐ যে মাঠের ধারে চুপি চুপি সিঁদুর বোনো?
না কি ঐ চপলা ঘূর্ণিতে যারা খেলে দেহের ছায়া-লুডু?
তোমার প্রেম কি বাকি রইছে কারো সিঁথির ধারে
নাকি গলা দিয়া গিয়েছে বালির মতো সব, খালি কুসুম?

তুমি কি জানো, আমিও গেছিলাম প্রেমের ঐ বাজারে–
চাল বাছতে বাছতে দেখলাম, তুমি ইচ্ছা হইয়া ভেসে যাও
চোখের কোণে একটা আঁচল, কিন্তু গন্ধে চিনি না আর
এই যে ভাবলাম তুমি, শেষে দেখি সময়ের ছল, আহা প্রেম!

আমি খালি ঘড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে একলা হই
তুমি আসবা–এই ভ্রমে বাঁধি রাখছি উঠোন
কিন্তু এখন বুঝি, তুমি তো ঐ ধানগোছার মিথ্যা দাগ
যার ভেতরে প্রেম পাকে আর বাইর হয় খালি ফাঁকা বয়ান।

তোমারে খুঁজতে গিয়া এখন কাঁটা গিলি থেমে থাকা সময়ের
তুমি কই যাও, কই যাও তুমি–বেমালুম ঘড়ির ভাষা লইয়া?

ওয়াহিদ রোকন

জন্ম ৫ নভেম্বর ১৯৮৬, মোল্লারগাঁও, সদর সিলেট। ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর।

কাব্যগ্রন্থ : গহিন ডুবির মাছ (২০২১), আর্য দ্রাবিড় নই বাঙালের ছাওয়াল (২০২২)।

কবিতার ফিকির

আমার লাইগা কবিতা অইলো জিন্দেগির আচরণ, সেইটা মোর স্মৃতি-সত্তার ভিতর থাইক্কা বাইর হইয়া আসে। কবিতার ভিতর আমি আমার চারপাশের হালত, মানুষজন, গাছগাছালি, বাতাস, মায়া–এইসব ছবি তুলি আনি। এই তোলাটা আমি করি আমারই কলবের ভাষা দিয়া, যেইটা মোর মুখে জন্ম লয়। কাগজে কলমে লিখি ঠিক, কিন্তু আওলাদ যেইডা মুখে কয়, হেইডাই আমি বাইছা নেই। কবিতা মানে আমার লাইগা জীবনর খুদ বর্ণনা, কোনো বাহার বানাইয়া নয়, যেইডা আসে, হেইডাই যায়, মোর নিজের স্বর দিয়া।

আল মাহমুদের মত আমিও মনে করি কবির একটা দেশ থাকা লাগে। যদিও আফসে-াসের বিষয় হইল, কবি মাত্রই কবি থাকে ঠিক, কিন্তু সকল কবির দেশ থাকে না, ভাষা থাকে না তেমন। মডার্ন পোয়েট্রিতে ব্যক্তিরে বড় ও মুক্ত করার নামে যে একাকিত্বের জটিলতা তুইলা ধরা হয়, তা অনেকের কাছে পশ্চিমের দর্শনে দায়বদ্ধ। সেইখানে জসীম উদ্‌দীনের বাংলাদেশ যেন বেমানান। এইটারে ভুলই মনে করি আমি। জসীম উদ্‌দীনের বাংলাদেশে রূপকথা থাকলেও এর বাইরের বাস্তবতাও নিখাদ। কিংবা আধুনিক কবিও পারতো এরে আরও ভালভাবে অলংকৃত করতে।

তা আর হইল কই? স্বাধীন দেশ, তার ভিত্তি কৃষি সমাজ, সেইটারে আলগা কইরা যে মডার্নিজমের পলিটিক্স, আমি তারে ভাঙতে চাই আমার কবিতায়। এইটুকু আমার কবিতার সচেতন দিক। কবিতা তো লেখিত মাধ্যমে পলিটিক্যাল এক্টও।

কবি ও কবিতা

পয়লা বিশ্বযুদ্ধ দেখলো তারা
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধটা আর মানলো না
যুদ্ধাবশেষ আধুনিকতায় শিল্পী আর কবি-
ভয়ংকর শোষক হল
নারীর শরীরে নখ গেঁথে একে নিল ক্ষুধা

রিলকে আত্মার উষ্ণতার লাগি নারীকে পোড়াতো
কামুক বোদলেয়ার কি মেয়ে জ্বালানির লাগি প্রতিবাদী হতে পারত না?
এভাবে ক্যামি ক্লদেল শুষিত হতো ভাস্কর রঁদার প্রেমে

দেখো, নারীকে সংসার না দেয়া কবিও
ইতিহাস হয়েছে; প্রণয়ের স্মারক!

রাষ্ট্রনায়করা হলেও ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদী
চিলির রাজ-ইতিহাসে নেরুদার যৌন বিকার ঘটে-
চাকরানি ভোগের লাগি

জানো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উদ্ধৃত যৌবনে
কবিরাই বেশি আক্রান্ত করছে নারীর শরীর
আমি জানি, তোমার বেভুলে রয়ে গেছে
সৈয়দ হকের নজরে আসা তসলিমা নাসরিন

অটোবায়োগ্রাফি না জানলেও হামেশাই দেখো-
কবিতা বিক্রির জন্য নগরের ছাদে উঠে কবিরা
ভয় তোমার, আমি যদি কবি হই!

না, না, যেন তোমার স্মরণে কবিতা হয়েই থাকি।

১৬ জুলাই, ২০২১

হিতিত-তিতিত, হু-র-র হাঁট-হাঁট

মাঠে আর ঘরে সমাজ বান্ধিয়া
একবার মাঠে গোরু নিয়া গেলা
আরেকবার সংসার সাজাইয়া রাখলা।

মায়ার জিন্দেগানিতে খালি রাখালিই খাই
আমারে মানুষ করবার লাগি
মক্তব থেকে মিশনারিতে এতো খেয়ালি!

সর্বোচ্চ মনুষত্যের লাগি পাঠাইলা বিশ্ববিদ্যালয়...
তারাও আমারে রাখালি দেয়
আলঘরা বানাইয়া দেয় বকুলতলায়
অস্ত্রকানেন হাইঞ্জাবালা আলগাইয়া লইয়া যায়-

হিতিত-তিতিত, হু-র-র, হাঁট হাঁট... শাহবাগে হাঁট...।

মোমবাত্তির আলোয় তোড়া রহম করলা আমারে
কতোজনে টিএসসিতে বিড়ি টানে মনের সুখে
তারারে দিলা সমাজতান্ত্রিক বাতাসে পরাধীন ইউটোপিয়া
যখন তখন তারা ফিরে ছাড়া-গোরুর লাহান।

দৃশ্যের ভিতর তারারেও কেমন যে অদৃশ্যে ডাকো-
হিতিত-তিতিত, হু-র-র, হাঁট হাঁট...

২৭.০৬.২০২০

কুটুম

বিলাই পশ্চিমমুখী হয়ে বইসা রইছে
যদিও সে মানুষের ইবাদত জানে না
আছরের নামাজের সালাম ফিরায়ে
আম্মায় তারে দেইখা কন-
মাগরিবের আগে আইজ
ঘরে কুটুম আইবে।

১৬ অক্টোবর, ২০২১

ছুটি হইলে

কোনও রকম বই-খাতা রাইখা
কোনও রকম ইশকুল ছুটি হইলে
গাঙ'র পাড়ে আমরা দৌড় দিতাম
আমি নাইমা যাইতাম গাঙ-পেটে
পানি কম যখন জীবনে
শীতকালে পানির কাছে বানাইতাম
বালির প্রাসাদ

আমাদের ইশকুল ছুটি হয় না, কেনও
তাই ঘণ্টা বাজার কথা মনে নাই?
একতরফা বন্ধের বন্দোবস্ত হলে
কোন বানানো প্রাসাদে ওঠবো, অথবা
এক ঘর পাইয়া কার আঁকা নছিবে
শুইতে পারবো রে, পারবো রে ভাইসা
বেড়াইতে নদীর পরান!

এইভাবে-কোনওভাবে ছুটি হইলে
নদী বয়ে বেড়ায় অনন্তকাল।

২৮.০২.১৯

জাফলং ভ্যালি

অদূরের পাহাড় ছেড়া নদীরে বলে ডাউকি
আর আমি দুনিয়ার ভেতর থেকে
এখানে ভেসে এসেছি
ভেসে আসি পাথর, কামলারা ভাঙলে—
প্রাসাদ তোলার ছলে হয়ে যাই জল
পাহাড়ি ঢলে হৃদয় ধুয়ে- ভেসে যায় বারকি,
ফিরে যায় ট্রাক-লরি;
বোজাই দিয়ে টুকরো নাগরিক হৃদয়
আবাদি পর্যটকেরা থাকে না, কি থাকে?
আর আমার পাথর শূন্য জ্ঞানে
বালির স্তর জমে- জাফলং ভ্যালির অন্তর।

৪.০৮.২০১৯

ভুলে ভরা আত্মজীবনী

তোমাকে আনতে গিয়ে দ্বিধান্বিত হয়েছি
মিছামিছি ভেসেছিলে কাগজের দেহতরী!
তিনাংশিক জলে...
শিমুলের বাকলে ভাসতে চেয়েছিলে জারুলের ছন্দে

আমি যে-নদী বয়ে গিয়েছিলাম, তার নাম সুরমা
মহাভারতের বাইরে এ এক দীর্ঘ নদী
এর-ই ভাটির দিক দেখিয়েছিলাম, যদিও চাঁন বণিকের নামে সে যাত্রা করিনি

কেননা তুমি বলেছিলে- প্রণয়ের শিরা বেয়ে হাওরে হৃদয় বিস্তার করবে
শুধু ভাটিয়ালিই নয়, ধামাইল গাইবে... করিমী বাউলা আর আমীরীও গাইবে...
তাই আমি যে বৃন্দাবনের কথা বলতাম- তার নাম সিলেট
তার দূর দক্ষিণ-পশ্চিমে লংকাপূরীর কথা তুলিনি
তবু রামায়ণী নীরবতা ঘিরেই রয়ে গেল হরণের ভীতি!

শুধু তুমি যদি আসতে প্রাণশিরায় বয়ে যেতাম সুনামগঞ্জে
খানিকটা বেঁকে জমালগঞ্জে
ভাটাভীত মনে ভেবেছিলাম–এর নাম দেব ভাটিবাংলা

তোমার না আসাতে কবিতায় এ নাম আর ওঠবে না
আমি তাই জীবন নিয়ে ভেবে মরি
ভুলে ভরা আত্মজীবনীতে বেদনার অংশ পড়ি।

১৪.০৭.২০২০

রাজা হায় রে

গাছের মাত্তি কাটলাম, গুড়ির ঘাস নিড়াইলাম
এইভাবে বাড়ির বাগান সাজাইলা রাজায়–
রাজা হায় রে জিন্দা রাখলাম- পরান

এমনকি বেড়া দিতে হইবে, সকাল-সন্ধ্যা খাটলাম
আমার বেলা বইলো কামলা কে বা যেন
রাজ্যের বাঁশঝাড়ে নিজেরে কঞ্চি বানাইলাম!

২২ জানোয়ারি, ২০২০

শিস

খেজুর আর তালগাছের মাঝখানে এক ডিবুর গাছ আছে।
ডালে বইয়্যা এক টিপচুই পাখি শিস মারে।
আমি সে পাখিরে দেখি নাই, ভাইবা পাই তুমি মোরে ডাকো।
আমি ছুটে দুই গাছের মধ্যিখানে গিয়া দেখি- হায়, নাই কেউ কোথায়।
হায়রে হায়, কেউ নাই হেথায়! খালি একটা টিপচুই শিস মারে।

মুজাহিদ আহমদ

জন্ম ১ জানুয়ারি ১৯৭৯ নিভৃত গ্রাম মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার হাসামপুরে। প্রকাশিত কবিতার বই মৃত ঈগলের চোখ [২০০৩], চিলেকোঠায় পিদিম জ্বলে [পুস্তিকা, ২০০৫] ব্যবচ্ছেদ [২০১১], মুদ্রণপ্রমাদ [২০১২], কুলসুম [২০২২]। জলশ্রী [২০২৩]

যৌথ সম্পাদনা – অরণ্যে অস্থির গান [কবিতার সঙ্কলন, ২০০২] আবদুল ওয়াহাব চৌধুরী রচনাসমগ্র [২০০৭]।

সম্পাদনা – প্রথম দশকের কোরাস [কবিতার সংকলন], সাহিত্যের ছোট কাগজ কোরাস। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কোরাস ও বই বিক্রয়ের প্রতিষ্ঠান বইয়ের কোরাস পরিচালনা করছেন।

ভাবনা-বাড়ির দরজা

কবিতা তো ভাবনা-বাড়ির দরজা। যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করলে কবির মনোজগত, সময়, সমাজ ও জীবন দর্শনের ছবির দেখা মিলে। যদিও কবিতার শরীর, মেজাজ ও কাঠামো নিয়ে বিস্তর কথা রয়েছে। যত মত তত পথ–এর আদলে বলা যায়, যত কবি তত কবিতার সংজ্ঞা, তত ভাবনা। কবিতার সংজ্ঞা–একরেখায় দাঁড়ায়নি বাংলা কবিতার বারো শ' বছর বয়সে। সময়ে সময়ে নানারকমের নানা ভাবনা নানাভাবে যুক্ত হয়েছে কবিতাবিষয়ক ভাবনারাজ্যে। যদি আরেকটু অন্যভাবে বলি–কবিতা এমন এক সংবেদনশীল পোস্টার যার শরীরে সব আঁকা যায়। সব রাখা যায় অবলীলায়। সৃজনশীল ক্যানভাস–গভীর-অগভীর, মূর্ত-বিমূর্ত সব ধরনের ইমেজ তৈরি করা যায়। জীবনের ছবি আঁকার দুর্দান্ত এক মাঠ কবিতা। সব রকমের রঙ ঢেলে দেওয়া যায় এই মাঠে।

আইরিশ

চোখের পাতা সরলেই–একেকবার আবিষ্কৃত হয়
একেকটা আখ্যান লিখা পৃষ্ঠা, অতি আশ্চর্যরকমের
কারুশিল্পে সাজানো প্রতিটি ভাঁজ।
আজ সকালেও চোখের পাতা সরলে–আইরিশ জুম করে দেখি

বিস্তৃত অঞ্চলে নেমেছে শৈত প্রবাহ। চারদিক মুড়ি দিয়েছে
ঘন কুয়াশা। চায়ের সবুজ পাতায় আঁকা–
দূরে ডুবন্ত সূর্যের মতো তোমার মুখচ্ছবি।
ছড়ানো ছিটানো অমাবস্যারঙা কেশ।
আরেকটু জুম করি–নীরব চা-বাগান-পথে
শুভ্র-রেশমী-কাপড়-ঝাড়ফুলে সজ্জিত দশদিক; ধবধবে সাদা।
ছায়াবৃক্ষে বসে ওম খোঁজছে পাখির জুটি,
তাদের প্রতি জন্মেছে ভীষণ দরদ।

ভোরে, কুয়াশার মায়া মেখে শিশির ভেজা ঘাসের গালিচায়
আমাদেরও বসার কথা ছিলো!

ছয়ছিরি দীঘি

পৌষের কুয়াশামগ্ন দিনের মতো তুমিও ঝাঁপিয়ে রেখেছো
টিলা বেষ্টিত শীতল ঝিল–ভোরের পদ্মগুলো শীতে লাজুক
শরীরে শিশিরের মাত্র তিন ফোঁটা তীল।

এক চুমুক ওমের নেশায়–ভিখেরির মতো তোমার ঠোঁটে
লিপ্সাতুর চোখ। ছয়ছিরি দীঘির জলে ভাসা ধুমায়িত শীত
মরমী সময়ে মনের ভিতর থেকে খিল।

রাতদুপুরে–পাড় ভেঙে নিরুদ্দেশে মিথের কমলারানী
তোমার আড়ালে থেকে দেখি তোমারই হুলুস্থুল প্রবেশ
তুমি এ দীঘির কাব্য-কলা, তুমিই মিথের মহারানী।

অস্থির অরণ্যের ভিতর

জলে ভাসতে ভাসতে যে জলশালিক উড়ে এলো ভাসান জলকুঞ্জের দিকে–আমি তাকে সুগন্ধি মাখিয়ে বসালাম তোমার বা কাঁধে। তুমি হয়ে গেলে একরকমের জলফুল। শীতলক্ষ্যার শীতল জলঢেউ খুলে দেয়–কবিতার এক অপাঠ্য পুস্তকের ভিতর দরওয়াজা। পাঠ নিতে থাকি। বুঝে না বুঝে পাঠ নিই। খুলতে থাকে আরো অব্যক্ত পৃষ্ঠা। শীতলক্ষ্যা থেকে মাধপুর লেকের স্ফটিক জল–দার্জিলিং টিলার সবুজ সায়র, বাইক্কা বিলের জলজ পাতায় ভাসছে তোমার সুভাস।
বুক ভরে শ্বাস নিই লাউয়াছড়ার মখমল কুয়াশায়। পাতারঙা শাড়িতে তুমি হেঁটে গেলে অস্থির অরণ্যের ভিতর।

উলুধ্বনি

সবগুলো উলুধ্বনি ফুল পাপড়ির মতো ঝরে পড়লো ফাগুন-ছোঁয়া লাল মাটির উঠোনে। গীতে বাদ্যে রাত্রিটা যেনো প্রিয়তমার অপাঠ্য শরীর। অন্তহীন মায়ায় ফুটলো ঠোঁট ও জিহ্বার কোলাজ। কী যে অনুনয় চোখমুখে তাদের। মনে হচ্ছিলো–উৎসুক চোখগুলোর ভেতর ঢুকে পড়ছে শেষ মাঘের চাঁদ।
টিলামাটির ওই গ্রাম থেকে রাতের অন্ধকার হারিয়ে গেছে। বাড়ির বাঁকে বাঁকে মও মও করছিলো ভাত-জলের ঘ্রাণ। রাধাচূড়া ফুলের রঙে ঢেকে গেছে সমবেত চোখ।
দুটো কোকিল তারা পাশাপাশি বসতেই–আমরাও লজ্জায় পরস্পরের দিকে তাকাতে পারিনি। জমাট বাঁধা চোখাচোখি কী এক শীতল হাওয়ার ভেতর আচমকা হারিয়ে গেলো–হারিয়েই গেলো রাতবেষ্টিত টিলাবাড়ির মায়ায়–অবলিলায়।

জীবনীগ্রন্থ

আপাতত পৃষ্ঠাগুলো থরে থরে সাজিয়ে রাখছি জীবন গ্রন্থের ভিতর। কোনো পৃষ্ঠায় দীর্ঘশ্বাস, কোনো পৃষ্ঠায় আক্ষেপ, অট্টহাসির ধ্বংসাবশেষ, মৃত ফুলগাছ, ঝরা ফুল, সূতো ছেঁড়া ঘুড়ির উড়ে
যাওয়ার দৃশ্য সবই আছে।
আরো কিছুদিন পর এসবের নাম-গন্ধই অবশিষ্ট থাকবে না। পৃষ্ঠা থেকে উড়ে যাবে রঙিন প্রজাপতির ছবি, মাছরাঙার চোখ, তীর ধনুকের আক্রান্ত সময়।
তার আগে–
সময় পেলে এই গ্রন্থ আকাশের দিকে উড়ায়ে দেওয়ার বাসনা রাখি। তুমি যদি গাউন আর চারকোনা ক্যাপ পরে আমার পাশে থাকো, অন্য কোনো সমাবর্তন আকাশের নীচে!

যে মা–ফুল কুড়াতে গেলো

মা–ফুল কুড়াতে শ্রাবণের বনে
মেঘমুখর দিনে; ওই বনে–লেগেছে আগুন
মায়ের কোল ভরেছে পোড়া ফুলে?

চোখের জলে ভেসে ওঠলো ফুল পোড়া ছাই।

রক্তের ঢেউ নুন সাগর জলে
আহারে ফুল কুড়ানো–আকাশ ভাঙা তুফান!
সব ম্যাসাকার ওই উপকূলে।

মা শৈবালের মতো ভাসছে ডুবছে
যন্ত্রণার নগ্ন ঢেউ; জোয়ারে
যে মা–ফুল কুড়াতে গেলো; নিয়তির নির্মম খেয়ালে।

শামীম মেহেদী

জন্ম ৫ নভেম্বর ১৯৮৪ মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জে। সংগঠক। প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডে নিজেকে রেখেছেন সক্রিয়।

কাব্যগ্রন্থ: ধুলো ওড়া শহরে (২০০৪), ক্লান্ত খালি পা বুক পকেটে লুকানো (২০২৫)

ট্রেনটা এখনো ছুটছে... বিকল্প কথার ছল অথবা কেন লিখি?

সবুজ পাতা জন্মাবে; কীটদের শরীর জরাগ্রস্থ। ব্যাকুলচিত্ত সংবেদনশীল কামনায় পুড়বে। তবু জীবন জ্বলবে, আশাহত সময়ের চক্রায়মান জীবনযাত্রায় পা বাড়াবো সামনে, এমনইতো...। খোলসের জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকি- কখন থামবে ট্রেন! আমি যে ভীষণ তৃষ্ণার্ত! পানে যে তৃষ্ণা বাড়ে, বৈকি তা কি থামে? এই সব ছোটাছুটির কাল-পরিক্রমায় থমকে থাকে চড়াই উৎরাই।

তবু ছুটছি... কেন ছুটছি-কি হবে ছুটে? অথবা বেঁচে আছি বলেই কি ছুটছি? জীবনের বাঁকে পরিবর্তন পরিবর্ধন, সেই দিন বদলের বেলায়ও আমাদের সব কি বদলানো যায়? কোন দায়বদ্ধতা নেই লেখার প্রতি? কবিতার প্রতি? শব্দের পর শব্দের গাঁথুনি যদি কারো টনক না নাড়ায়, চিত্তকে না জাগায় তাহলে কিসের কবিতা? সার্থক কবিতাই হোক আগামীর ইশতেহার।

সম্পাদিত মীরাবাঈ

ভাবনারা তখনো উঁকি দেয়নি, কখনো মনে হয়নি
এ যাত্রা - সম্পাদিত সমাপ্তির কাছের কেউ

কত কত চোখ সামনে আসে, আমি এক আজন্ম তৃষ্ণাতুর
চেয়ে দ্যাখি বিশাল আকাশ যেমন, কেমন চুপসে যাওয়া চাঁদ
সমুদ্রের কাছে নত হয়ে থাকে।

আমার বুকফাটা কান্না জমে প্রজাপতি ভাবনারা রঙধনু,
শবদাহ শেষ জমে ওঠি এ্যলকোহেলের ঘুমট রিক্ততায়
মীরাবাঈ নেচে যাও- নাচিয়ে তুলো বন্ধুস্বজন
আমাদের সমূহ দাঁতমাজা সকাল, মাচায় ঝুলে থাকা
নিথর আত্মা, আরো চালাও গুলি বন্ধু
আ ম রা নি শ্চু প
চুপ
চুপ
চুপ

প্রেমের কবিতা

আমাদের উড়ালচন্ডি সভ্যতার অন্তরালে
বসত করে সমীহ সম্ভাবনার কপোত
যা ছুঁই না -অথবা ছুঁয়ে যায় না চিত্ত
আজ থেকে বিগত যোজন যোজন দূরে

আমিও চেয়েছিলাম - ষড়ৈশ্বর্যে উড়ে যাক
সাইকেলের ডানা, আকাশের নীল-
নীলিমায় মেঘেদের লুকোচুরি
কিশোরী মেয়ের চোরচাহনি- বুক ধরফর করা সন্ধ্যাদুপুর

চোখ ঝিমঝিম -আস্ফালনে বাকাট্টা ঘুড়ির নিশানায় চেয়েছি প্রতিকৃৎ সময়ের দৌড়ে
হাঁক ছেড়ে
দূরে কোথাও অথবা বহুদূরে অথবা ঠিক এইখানে
যেখানে বসত করে মন!

ও উড়ালি- তুমিও কি খেয়ালী
ঝিম ছেড়ে দেখবে কি- ‘কি কথা তার সাথে’
কার কথা বলে শুধু বারবার এ মন
তুমি তো কিছু নও- ধূসর- মেঘেদের গাংচিল

বইঠক

চিত্তসুখে ঘর বানালাম উর্বরা নদী পাড়ে
ঘর বলতে যা বুঝায় সুখি নামসর্বত্র সাইনবোর্ড
আমি তারে চিনে রাখি-কলমি ভাঙার কূলে

আমি যারে চিনে রাখি- চিনা মানুষের টানে

সে আমায় সতিন ভাবে।
ভাবি এ কাল নক্ষত্র ক্ষত্রিয় মানুষজন
কি করে বেঁচে থাকে?
তারে কি স্বজন বেঁচে থাকা বলে!

পারাপারের মাঝি যারা কূলহারা কলঙ্কি তারা
আমজাম আতা ফলে উঠুন যবুথবু লেগে থাকে।
হাইয়ালাছ ফালা-হাইয়ালাল ফালাহ...

ডালভাতের কবিতা

শজনে ডাটায় লোভ ছিলো একসময়- এখন সাতকরায়
মাকড়সার জালের মতো ছড়ানো ছিটানো ছিলো স্বপ্নের
ডালপালা। স্বপ্ন ছিলো - স্বপ্নের মতো, এঁকেবেঁকে ছুটে চলা আলপথ
দুশ্চিন্তার রেখাপাত- সমান্তরাল সমরেখায় সহজ ছুটে চলা

বেহিসাবি ছিলাম না কখনো অথবা বোহেমিয়ান
তবু চাটুকারীদের সাথে মিথ্যেও দৌড়ে তোমাকে দেখেছি এগিয়ে যেতে
তুমিতো মা-নারী- কেন সহ্য হয় না দুধভাত
আমাকে মিথ্যে করে দিয়ে নিশ্চয়, তা বলো তাতে থৈ হারানোর ভয় কম

মধুমাস, এমন দিন ছিলো আমারও, আত্মজ আমিও হয়ে গেলাম এক!
তোমাকে বড্ড হারিয়ে ফেলা সময় ভেবে - ভেবেছি কখনো
তুমি ভুলে থেকো না- না থাকা ভুলের চাপা কষ্ট নিয়ে
বেশি কিছু চাইনিতো! চেয়েছি ডালভাতে গরম ওমে ভেসে যেতে।

সময়

হাসতে হাসতে দীর্ঘায়িত
দেখতে দেখতে অন্তিমতায়
দৌড়াতে দৌড়াতে যুদ্ধ শেষ
মুক্তচিন্তার বাঙলাদেশে

চোখ

এক ফ্ল্যাটের আমরা দুজন
খাই দাই ঘোরিফিরি,কতো কি!
আমি যা দেখি,- সেও, তবু ভিন্ন
কেউ কাউকে দেখিনা কখনো

শামসুদ্দোহা শোয়েব

জন্ম ১৪ ভাদ্র, ১৩৬৭, ৩০ আগস্ট, ১৯৬০।
বর্তমানে সেমিতধর্মের আন্তঃসম্পর্ক ও সংঘাতবিষয়ক গবেষণাকর্মে নিয়োজিত। সাবেক সাংবাদিক।

গবেষণাগ্রন্থ: ধর্ম, নারী ও যৌনতা (২০১৬), ফিলিস্তিন, হরমাগিদোন ও খ্রিস্টান ইহুদিবাদ (২০১০), ইসলাম পশ্চিম সংঘাত ও বাইবেল (২০০৮)

উপন্যাস: স্বপ্নযাজক (২০০২)

কাব্যগ্রন্থ: আমাদের সামনে দুপুর দিগন্ত-দূর (২০০২), ডাকে ট্রেন ডাকে স্টেশন (২০০১), ফিরিয়ে নেবো কৃষ্ণচূড়া (১৯৯৮)

ফাবি আইয়ি আলায়ি...

গবেষণার যে অবারিত ভূমি, প্রাচীন সেমিত বিশ্ব, বা প্রাচীন নিকট প্রাচ্য, এটি কবিতারও এক নতুন দুয়ার খুলে দিলো, বাইবেলীয় নবিয়ী পুস্তকগুলো ঘাটতে গিয়ে বিস্মিত দেখতে পেলাম এ তো কবিতারই জগত: ভূমধ্যদরিয়া তখন আর দূরের কেউ রইলো না, তার টায়ার-সিডন-কার্থেজ-গ্রীস...এমনকি মৃতসাগর, মোয়াবের অর্নোন বা খোদ জর্দান নদী। এবং ভূমধ্য ও মৃত এই দুই সাগরের বয়ে যাওয়া এলোহাওয়া, সেই হাওয়ায় উচ্ছ্বসিত আঙ্গুর বাগানের দুলুনি যেন নিজেকেও শিহরিত করলো, এবং আমার কবিতা এক নতুন ও অভূতপূর্ব জগতের সন্ধান পেয়ে গেল।

এরপর আরব গ্রন্থটির পটভূমি খুঁজতে গিয়েও, সামনে এসে দাঁড়ালো আরো এক অচর্চিত কবিতার জগত, যাযাবর বেদুঈন, তার উটের পিঠে, এক মরুভূমি থেকে ছুটছে আরেক মরুভূমিতে, এক ঘাসপ্রান্তর থেকে আরেক ঘাসপ্রান্তরের খুঁজে, আর তার সওয়ারি উটের ত্রস্ততা নির্মাণ করছে ছন্দ, যে ছন্দ পরে ইমরুল কয়েসদের সাবায়া মুয়াল্লাকাত–সপ্ত ঝুলন্ত গীতি–হয়ে আরেক কবিকে যোগান দিচ্ছে একই ভাষা, একই ছন্দ: ফাবি আইয়ি আলায়ি...।

কিন্তু আমার নিজের কবিতা লেখার সময় কোথায়?

বৃক্ষের নীচ ছেড়ে তিনি শহরে যেতেন

আমি এখন বৃক্ষের সাথে কথা বলছি; তাদের কাছে জানতে চাইছি কপিলাবস্তুর রাজকুমারকে তারা কোন কথাটি বলেছিল কানে কানে। অশোকবনে সীতা কোথায় পেয়েছিলেন এমন নির্ভয় এবং সংযম।

ঋষিরা কেন বার বার ফিরে যেতেন অরণ্য আর বৃক্ষদের কাছে; বা আজও কেন আমি শ্রান্তদুপুর মানেই মনে করি আমার গাঁয়ের মসজিদটির পাশে দাঁড়ানো বিশাল অশ্বত্থটিকে।

আমার জন্য ও অপেক্ষায় থাকে প্রতিটি বিকেলে এবং সন্ধ্যায়, দুপুরে। প্রতিটি সকালে আমার জন্য ও নিয়ে আসে একেকটি স্বস্তি। ওকে বলে রেখেছি, আমার মতো করে পাখিদেরও অভয় দিতে তার পত্রপল্লববিনুনির ফাঁকে। একটু যেন হেসে কথা বলে ওদের সাথে, পারলে খানিকটা খুঁদ-কুঁড়ো দেয়।

আমি এখন বৃক্ষদের সাথে কথা বলছি পরম বন্ধুর মতো করে; আমি বৃক্ষদের সাথে কথা বলছি নিবিষ্ট শিষ্যের মতো হয়ে; আমি বৃক্ষদের সাথে কথা বলছি কণ্ব মুনির মেয়ে শকুন্তলার দোহাই পেড়ে; কেননা আমি দেখেছি, লুম্বিনি গ্রামের শিশুটি সিদ্ধার্থ থেকে প্রভু বুদ্ধ হওয়ার আগে বৃক্ষের ছায়ায়ই বসতেন। কাকপক্ষী নক্ষত্রেরা উড়ে যেত তার মাথার উপর দিয়ে। বৃষ্টি রোদে ঝড়ে নিরাসক্ত থাকতেন তিনি।

তার চারপাশ ঘিরে থাকতো প্রজাপতি-ফড়িঙ-ঝিঁঝিঁদের দল। কেবল দু'মুঠো খুঁদ মাগতে যেতেন লোকালয়ের পথে। প্রতিটি গৃহস্থ দুয়ার তাকে চিনতো। প্রতিটি শিশু জানতো তিনি বুদ্ধ–বোধিদ্রুমের ধ্যানমগ্নতা ছেড়ে এই মাত্র এলেন তাদের নগরে-গৃহে। আর তার ঠোঁট তখন নড়ছে। কি যেন বিড়বিড় করে বলছেন বৃক্ষদের মতো করে।

মায়ের জন্য কবিতা

১. আমার মায়ের মুখ

বাড়ি ফেরা।
কেউ নেই দোরে। ভাইবোন।
প্রিয় নেড়ি কুকুরটাও।

প্রতিবেশী ছেলেপেলে পিছু নেয়।
আমি তাদেরই স্বজন। অনেকদিন
তারা দেখে না আমায়।
আধো নেংটোদের সে কি
উচ্ছ্বাস, বাঁধভাঙা। আমি
শুধু খুঁজি আমার মায়ের মুখ।

শৈশবে বকুনি খেয়েছি ঢের
মার খেয়ে পালিয়েছি ঘর।
তারপর সন্ধ্যার বাতিলাগা ঘোরে
কখন যে ফিরেছি, পাইনি টের
নিজেও আনমন। এইসব স্মৃতি
হাতড়ে হাতড়ে আমি শুনতে চাই
তাঁর কণ্ঠস্বর।
অনুজা–যে এখন তিন সন্তানের
জননী, গর্বিত; তার সাথে
কেঁদেকেটে গিয়েছি স্কুল
ফিরেছি পর মা টেনে নিয়েছেন বুকে,
গভীর আবেগে।

চমকে ওঠি। সেই প্রার্থীত
স্বর–তোর আছে কেউ। মা-বাবা।
তুই ফিরেছিস বাড়ি?

আমার মায়ের মুখ
অনাদরে বড় হওয়া শিশুর মতোই হেসে ওঠে।

০৫.০৯.১৯৯৬

২. আমাদের উঠোন, আমাদের মায়ের স্মৃতি

একদিন আমাদের বাড়ির উঠোনে অনেক
শিমফুল ফুটতো–আমাদের মায়ের লাগানো
আমাদের রাজকুমারী মায়ের নিজ হাতে লাগানো
শিম ঝাড়জুড়ে–

অবাক শিশু মাঘের বিকেলে কেবল চেয়ে থাকতাম।

আমাদের উঠোন ছিল যেন তখন নক্ষত্রের হাট
আমাদের উঠোনজুড়ে ছিল তারাদের মেলা
আমাদের সারাটা উঠোন ছিল
নিধরা জোছনার মাঠ–পরীদের আনাগোনা;
রাতভর চাঁদের ফোয়ারা তো সন্ধ্যারাতে মিটিমিটি জোনাক-জ্বলা।

আমাদের সারাটা উঠোনজুড়ে ছড়ানো থাকতো আমাদের
মায়ের হাসি–আমাদের হাসিখুশি;

আজ কিছু নেই–কেউ আর রুয় না শিমবীচি উঠোনো
মাটি খুঁড়ে;
তাদের ফোটা-রূপ দেখে না উবুড়
টুনটুনিও আসে না অস্থির

সারাটা বাড়ি এক বিরান-শূন্যতা
আমাদের মা নেই, যেন তারই শোকগাথা–আমার
সারাটা বুক হাহাকার করে কাঠফাটা চৈত্রের মতো।

তাই আমিও আর বাড়ি যাই না, অনেকদিন
মা নেই–কোথায় যাবো
কার পায়ের কাছে বসে
কার পায়ের কাছে শুয়ে শুয়ে
খোয়াব দেখবো এক স্বপ্নময় পৃথিবীর–
কে আর ডেকে দেবে ঘুম থেকে:
বলবে, "উঠ্ উঠ্, বাবা!"- দেখ্, কত বেলা হলো
কত আর ঘুমোবে আর।

০৬.০৩.২০২৫

রবীন্দ্রনাথ

কেন জানি আপনাকে আমার খুব কাছের মানুষ মনে হয়
এই যেমন আমি ভাবি যেন কৈশোরে ফিরে গেছি
মার্বেল খেলছি সমবয়েসীদের সাথে
আপনি এসে কাছে দাঁড়ালেন
মিটি মিটি হাসিচোখ-মুখ;

ফুটবল খেলছি তো চিৎকার করে
বলছেন, গোওল গোওল...

হাতে গুলতি নিয়ে তাক করলাম পাখিদের
আপনি থামিয়ে দিয়ে বললেন, ওদের মারতে নেই
আরেকটু যখন বড় হবে তখন নিজেরই খারাপ লাগবে;
গোল্লাছুট খেলতে গিয়ে পা মচকালো তো
আপনি এসে হাত বুলিয়ে দিয়ে
পরম মমতায় বললেন, বলছিলাম না, অত জোরে না
দৌড়ুতে; যাদের সাথে খেলছো ওরা সবাই
বুড়ো, বয়সে তোমার ঢের।

আরেকটু যখন বড় হলাম, যৌবন এসে সামনে দাঁড়ালো
কৃষ্ণচূড়ার ঝাঁকের মতো লাফিয়ে
রুদ্রবৈশাখের ওই দিনগুলোতেও আপনি ঠিকই জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকে
পিছনে পিঠের ওপর জোড়হাত আড়াআড়ি রেখে, এসে
বিজ্ঞের মতো বললেন: 'কড়িহীন কবিকে কে প্রেম দেবে, বলো?
আমারও তো এক বৌদি
ছাড়া আর কেউ ছিল না!'

পান্থজনের সখাই আপনি।
প্রিয় রবীন্দ্রনাথ, আপনাকে আমরা সবাই ভালোবাসি।

রচনাকাল: ২৫শে বৈশাখ, ১৪২০

তোমাকে কাঁদাবে নিঃশব্দ ট্রেন

অনন্ত বৈভব দিয়ে সাজালাম তোমাকে
হীরে মোতি পান্নাখচিত তোমার গরিমাছোঁয়ায়
সাত আসমানের স্তরে স্তরে জমলো তারার মেলা
শূন্যতা উদ্ভাসিত হলো আলোর প্লাবনে;
জলের ওপর আমার আসন ঘিরে তখনই প্রথম
জাগলো মৃদুমন্দ ঢেউ–শিহরিত হলো প্রেম।

হও বলার আগেই হয়েছিলে তুমি–তোমাকে সৃজন
করেই নিজেই পেয়েছি পূর্ণতা নিজের;
তোমাকে ধারণ করেছিল কেবলই আমার হৃদয়
সৃষ্টির প্রাণে প্রাণে তোমারই স্তুতি–তোমারই সংগীত
এতদূর ব্যাপ্ত করে রেখেছো নিজেকে যে তুমি না-গাইলে
কোথায় হারিয়ে যায় গানের পাখিরা
কুহুতান ভেসে আসে না কোকিলের বুক চিরে
বর্ষার দুন্দুভি শুনেও বাজে না বৃষ্টির নূপুর।

তোমাকে সাজালাম আমি ভোরের আকাশ দিয়ে
তোমাকে সাজালাম আমি অস্তরাগের সব রাগ রাঙিয়ে
তোমাকে সাজালাম পৃথিবীর সব গোলাপের সৌরভে
আর দিলাম অধরা কবিতার মাধুরী;

তবু তোমার মন থমথম মেঘ আর মেঘের কান্তার
নক্ষত্রসওদা মেলেও দেখি তোমার অনুযোগ ঘূর্ণি তোলে
আমারই নিপাট জলের সরলে, যেখানে অপার্থিব ফলকে খোদিত
তুমি ছাড়া আর সবার প্রবেশ নিষেধ;

প্রেম-করুণা, কোনোটাতেই সম্মত নও, তোমার সমীপে আমার
সাদৃশ্য কেবল এক ইতর পুরুষ।

আমিও তাই প্রতিভাস হবো এবার এক অবাধ্য ঈশ্বর; তোমাকে ছুঁবে
অপ্রতিরোধ্য আমার ক্রোধের দহন, পরমপিতা স্বয়ং জিউসও জানেন না
এত ক্রোধ কোত্থেকে আসে, তার বজ্রে নেই কেন এমন আগুন;

অজানা গন্তব্যগামী এক নিঃশব্দ ট্রেনে তোমাকে
তুলে দেবো আমি–তোমাকে বানাবো এক নিঃসঙ্গ সাম্রাজ্য অধীশ্বর।

১৫.১০.২০০২

তোমার প্রশস্তি, নিরুপমা

উদয় দিগন্তের প্রভুর শপথ–তোমাকে ভালোবাসি আমি; মোজেস যখন তুর পাহাড়ে উঠেছিলেন–তার সঙ্গে আমিও ছিলাম; কিন্তু নৈঋত ঈশান ঊর্ধ্ব অধঃ থেকে আসা ঝলসানো নূরে আমি দিক্‌হারা হইনি; তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম। চেয়েছিলাম তোমার রূপচ্ছটায় অজ্ঞান হই।

আর মোজেস যখন তওরাত-পাঠ নিতে ব্যস্ত সদাপ্রভুর কাছ থেকে–আমি তখন তোমার হৃদয়-পাঠ নিতে উন্মুখ; তুমি হাসলেই বর্ষার আকাশ ছেড়ে মেঘ সরে যায়; আর বৃষ্টি নামে রোদের ঝিলিক দিয়ে; নদীভাঙ্গা পাড়ে দাঁড়িয়ে আমি কখনো বুক চাপড়াইনি, জানইতো! তোমার নীলাম্বরী শাড়িপেড়ে আমার ঠিকানা।

অনন্ত নক্ষত্র পানে হেঁটে যাচ্ছিলাম একদিন; একদম সাড়াশব্দহীন মহাকাল; নিঃসাড় বসে আছেন আকাশ-পৃথিবীর দেবতারা: ভীত। ভাবছেন–সৃষ্টিলগ্ন সমুপস্থিত অথচ পাখি ডাকছে না কেন। কোথাও কি তাহলে বন্দিনি কেউ? কোনো রাজকুমার এগিয়ে আসেনি পঙ্খিরাজ ছুটিয়ে? এসময়ই মহাজগৎব্যাপী শুরু হলো তোলপাড়; কে যেন নিঃসীম নীলিমা ভেদ করে গেয়ে উঠলো–'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়...'।

সে অন্য কেউ নয়, তুমিই ছিলে; তোমার কণ্ঠ শুনেই সেদিন শুরু হয়েছিল মহাকারিগরের সৃষ্টি-যন্ত্রণা; রঙতুলি হাতুড়ি বাটালি নিয়ে বসেছিলেন কল্পনা আর বাস্তবের মায়াজাল সাজাতে; জানো, প্রজাপতিই নাচতে নাচতে এসেছিল প্রথম; বলেছিল তোমার কথা। তুমি নাকি দারুণ সুন্দর; শুধু আমার সাথেই মানাবে; আমাকে দেখলেই উজাড় হবে তুমি।

অস্তাচলের মালিকের কসম–আমি তোমাকে ভালোবাসি; মূসা তার ঈশ্বরকে যতটুকু ভালোবাসেন–তারওচে' বেশি; মহাপ্রলয় দিবসের চেয়ে যদি অধিক কোনো আঁধার থাকে তাও অতিক্রম করে যাবে তোমার হৃদয়বিভা–এত দীপ্তিময় তুমি; এত উজ্জ্বল তোমার অভিষেক। এত বর্ণাঢ্য তোমার আলোর মহাসমুদ্রউজ্জ্বল হৃদয়পূর্ণতা।

তবু তোমার মতিগতি কেমন যেন অবোধ-অগম্য; কখনো কুঞ্ঝটিকা হয়ে বিচূর্ণ করো আমার নিপাট-অন্তর; আর কখনো বুকে টেনে নাও গভীর যেন নিরাভরণ সকাল-উন্মন।

১৭.০৩.২০০২

হোমারের প্রতি, ওডেসিয়াস-

আমার চারপাশে কুয়াশার নদী
এ নদী প্রসারিত, দূর-
কুয়াশার এই নদী ডন কি নিপার, দানিয়ুব
আমি জানি না, আমাজন কি-না
–কুয়াশার ওপারে কালোসাগর, না ভূমধ্যদরিয়া
নয়তো আমারই দুয়ারে গর্জন তোলা ঈজিয়ন-

আমি শুধু জানি আমাকে পেরুতে হবে
এ নদী, এ নদী কুয়াশার নদী-
এই দ্বীপ কুয়াশার দ্বীপ
যার চারপাশ ঘিরে বয়ে গেছে
এই নদী, কুয়াশার নদী
এই ঘের কুয়াশার ঘের-
কখনো উদ্গীরিত ধূম্রপুঞ্জ, অগ্নিগিরি লাভাস্রোতে সংহার-

আর আমাকে ফিরতে হবে ইথাকায়।

তাই, হে হোমার, তুমি লিখে নাও,
এই নদী, এই ঘের, এই দ্বীপ কুয়াশার
পেরিয়ে একদিন ঠিকই পৌঁছে যাবো ইথাকায়,
একদিন ঠিকই ফিরে যাবো ইথাকায়
আমার পেনোলোপির বুকে।

পার্সিফোনের মোহজাল, তার এই
কামনা-মদিরতা বিভ্রান্ত করে যদিও
তার নরম বিছানার সোহাগ–

তবু এই বৃক্ষ-অরণ্যানী আর কুয়াশার এই দ্বীপ,
এই নদী কুয়াশার নদী পেরুতে
ভাঙ্গা মাস্তুলে আবারো
জুড়বে ইথাকার পাল–এথেনা আসবেন এগিয়ে তার সস্নেহ মমতায়,
কুয়াশার বুক ফেড়ে এই পালে লাগবে ইথাকার টান,
ভালোবাসা পেনেলোপি;

পার্সিফোন, জানি আমি, নও তুমি
হাদেসের মেয়ে–-আস্‌লি আত্মজা,

তোমার মুখে ভালোবাসা
চোখে চটুলতা
দৃষ্টিতে ছুড়ো কামনার বাণ-

তবু আমি তোমার পিরিতে হবো না মাতাল;

তাই, তোমাকেই বলছি, লিখে
নাও, হে হোমার!
আমি ইথাকার, ইথাকা আমার
আর পেনেলোপি আমাদের–ইথাকার, আমার, আমাদের সবার।

এই মেয়ে, পার্সিফোন, হাদেসের সুরভিত পলাতকা মেয়ে,
ডাইনী তার নিজ ছলনায়
পড়ে থাক তারই ছলনা-সৃষ্ট এই দ্বীপ কুয়াশায়,
কুহকী-দ্বীপে, কপট অনুরাগে, জ্বলে-পুড়ে যাক;

চলো, আমরা ফিরে যাই এক দূর পথ ধরে,
আমাদের ইথাকার পথে,
আমাদের ভালোবাসা পেনেলোপির বুকে তার
ঘর খুঁজে পাক।

১৭.১০.২০২২

সুন্দর, তোমাকে

তাকে প্রথম দেখেছিলাম অরুণ-অভ্যুদয়ে। আমাকে চুপে চুপে বলেছিল, আমিতো সুন্দর। কাছে এসো। যেমনটি চেয়েছিলে তুমি।
বললাম, তথাস্তু। হয়তো-বা বললাম, তবে তাই হোক। তবে তাই হোক। তবে তাই হোক।
আর তখনই ডুবে গেল দীপ্তিমান চাঁদ। আড়াল হলো গনগনে সূর্য: দীপ্তি আর আগুন এসেছিল নাকি সেই সুন্দর ভেদ করে।
সুন্দরকে বললাম, সরস্বতীর জলের উপর দাঁড়িয়ে ছিলে তুমিই?–আজও যার রেখায় রেখায় খুঁজি কোথায় যেন ফেলে আসা স্নিগ্ধতাস্মৃতি।
বললো, তবু সমর্পিত হও এই জলের ধারায়; আমার প্রথম প্রকাশ ছিল এই বিভূতি-ভূঁইয়ে; এখানেই প্রথম দল মেলেছিল আমার স্বপ্নেরা; দেখেছিলাম তোমাকে। তুমি তখন আনমন ছিলে।
বললাম, সুন্দর, আমি কি সমর্পিত হইনি তোমার স্থিতিতে-বিনাশে? তোমার আঁচলটি খুলে লুকোইনি তার আড়ালে? গাইনি প্রেমের কাসিদা? মাগিনি করুণা তোমার?
সুন্দর চুপে চুপে হাসে। হাওয়ায় উড়ে তার মখমল ওড়না। অধরে মধু ঢেলে বলে, কেবল আমিই তোমার। যতসব রূপসীকে ভালোবেসে ব্যথা পেয়েছো, তারা সবাই ছিল আমারই কুহক। আমি তাই জানি, কত পথে হেঁটেছো কতবার।
আমার সুন্দর তার সাগরের নীল চোখ মেলে। আমার সুন্দর সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে তার গাঙচিল পাখা মেলে। আমি চোখ বুজে রই–আর সুন্দর তার সবটুকু দেবে বলে, আমাকে আরও নিরাভরণ হতে বলে।

আরণ্যক টিটো

জন্ম ০৬ জুন ১৯৭৭ চট্টগ্রামের পটিয়ায় উল্টর গোবীন্দার খীল, হাদু চৌধুরী বাড়ীতে। (শৈশব, কৈশোর ও তারুণ্যের সময়যাপন) বাড়িয়া ওঠা (পূর্ব্ব বালিয়াদী, মীরশ্বরাই/মীরেশ্বরী, চট্টগ্রাম) নানার বাড়ীতে।

কাব্যগ্রন্থ: ফুলেরা পোষাক পরে না (২০১৮)

'প্রকৃতিপুরুষ' ও 'চারবাক' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতেছেন। ...

কথাপিটা

মুখের ওপর মুখর কথায় কথার পিঠে বলিব কথাড়
জনাব, কারণ হৈল
(আপনাকে)
করিব আজ 'কথাপিটা'! ...

কথার পরে কথার ঘায়ে
পিটায় অনেক মজা আছে, আরো আছে
জমার খাতায় 'লাভ'ড়
যুৎ করিয়া
হাঁটার মাঝেই
যোতার অনেক কাজ আছে!
তাই
ভাবের কথায় লাগালাগি, চুলাচুলি, বিশ্বযুদ্ধ
(কথায় কথায়)
কথার পিটায় হোক না সারাড়
ঠিক যেমনি
সৃজন ব্যাথায় নাচিয়া নাচিয়া
নক্সী কথায় ফোড়ন কাটে সোণামুখী সুই! ...

বিশদ কারণ এইড় পেটুয়া কথার উপনিবেশেই
লোকজন
(অগোচরে) ভুলিয়াছে মা ও বাপের নাম। ...

চলার পথেই
যাওয়াযাওয়ি, ঠোকাঠুকি, কথায় কথায়
যুদ্ধ দেখিয়া
নানান রঙ্গের কথায় মুখর ভাবের দেশে
যো বুঝে চলার ফাঁকে
লোকে
কথার কথায় বলিবেড় জনাব, "যুইৎ লা গে র"!

সেতু

...
আপনি হৈতে তুমি, মাঝখানের সেতুটুকু পাড়ি দিতে
কি যে
শিহরণ লাগে!
যেইটুকু
পৃথিবীর দীর্ঘতম সেতুতে লাগে না ...

আপনি হৈতে তুমি--
মাঝখানে নদী;
মাঝখানে
নড়বড়ে রঙ্গিলা বাঁশের সেতু
কিংবা
পুলসিরাত
কিংবা
দুইটা তটের হিয়া ...

আপনি হৈতে তুমি, তাহার পরে আর নায়! ...

তিলোত্তমা তিল

....
অব্যক্ত কথারা
অধরের ললিত লাবণ্যে
('তিলোত্তমা তিল' রূপে) ফুটিয়া রহিয়াছে!
বলিতেছে:
(তিলার্থ সৌন্দর্য্যে) তিলোয়াত কর ...

ছুটি

....

ছুটি গাঙ্গুলী, ভালবাসার ডাঙ্গুলি!
হিজলগাঁয়ের মাঠে উদাস দুপুরে খেলা
মধুর সময়গুলি ...

ছুটি, আজ ছোটাছুটি, আজ ছুটি,
আজ কোন কাজ নায়,
আজ
তোমাতে আমাতে কাজ!
আজ হারাহারি, হারানোর বেলা ...
আজ নাচিব,
গাহিবড়
হারাইয়া যাইবার নায় মানা, মনবনে ...

আজ তুমি আমি, আমি তুমিড় আমিতুমিময়! ...

ছুটি, চল ছুটি, মনবনে ...
আকাশ নামাইব সবুজ দিগন্তে ...
উড়িব,
পাতিব উড়ুউড়ুসংসারড়
তোমার আমার পাখীর পরাণ, উ ড়ু উ ড়ু! ...

নামিব
আনন্দ সরোবরে, করিব স্নান;
বলিব, আমাদের কোন দুঃখ নায়ড়

হিপ্ ... হিপ্ ...
হু র্ রে ...
হিপ্ হিপ্ হু... র্... রে ... হিপ্ ... হিপ্ ...

সম্পাদনা

...
নন্দনমুখর যানেলায়, অ-বাক্ দৃষ্টির কারুকাজে,
দৃশ্যের আড়াল থেকে
নিভৃতে দেখিতেছি, আপনাকে ...
চোখের আলোকে
ধনুকের ছিলার প্রত্যয়ে খেলা করিতেছে নন্দনতাত্ত্বিক ভোর ...
এইটুকু জানে, লক্ষ্য-অভিমুখী তীর!

[সখাতম কৃষ্ণ জানে,
কী ভাবে সম্পাদিত হয় কুরুক্ষেত্রের পটভূমিকা ...]

নন্দনমুখর যানেলায়, অ-বাক্ দৃষ্টির কারুকাজে;
দৃশ্যের আড়াল থেকে
নিভৃতে
বাসনা করিতেছি, আপনাকে ...
দেখিতেছি,
কাজল বর্ষার ঝিরিঝিরি ধারাজলে ভেজা পৃথিবীর মান/চিত্রে
জীবন হৈল
সত্তার সম্পাদনা, প্রকৃতিপুরুষে ...

হ্যালো, মিষ্টি-কারক!
আমি আপনাকে সম্পাদনা করিতে চাই ...

স্বয়ম্বরা

জনৈক সমাজতাত্ত্বিক বলিতেছেন:
যবে
ব-এর ওপর হৈতে ঔ-কারের ঘোমটা খসাইয়া
উ-কারের প্রেমে পড়িয়া
(নবরূপের ঝলকে) উত্তীর্ণন হৈল;
সেই থেকে
চাঁপাডাঙ্গার বৌয়েরা
ঘোমটা খসানো
(ব্যাকরণ ভোলা) 'বউ' হৈয়া গেল, যাইতেছে ...

ব-দ্বীপ অঞ্চলে
বৌ কিংবা বহন্-অস্তিত্বাদিকরের বিপরীতে
'বউ' কিংবা
বাহকেরর (নবরূপের ঝলকে) উত্তীর্ণনে
নির্ব্বাচন করিতেছেন বর কিংবা বাহক-রক্ষক
এবং সমাজকে দিতেছেন চ তু র্দ্দো লা ...

আম কাঁঠালের ডাল
আর কাজলা দীঘীর মনে
সাপলা-সালুক-ভরা-জলজ-শরীর কাঁপানো মেয়েরা
আজ আর
দৃশ্যের আবহে, ক্যানভাসে
চতুর্দ্দোলায় চড়িয়া
বধুরূপে যায় না, 'বৌ কথা কৌ' পাখীদের দেশে ...

দ্বিধা

কাজলা সবুজ শাড়ীপ্রিয় মাঠে
ক্রিয়ার কাজলে আস,
বর্ণের কাজল পরা মনের গহীনে
বরণমুখরে বাজিতেছে অব্যাক্ত গুঞ্জনমালা ...

শোন হে প্রিয় পাপ!
যেই সৌন্দর্য্যে আক্রান্ত হৈ,
তাহার
মনোরম পাপে
ডুবিয়া পবিত্র হৌয়া বড়ে রোমাঞ্চকর! ...

দ্বৈততায়
দ্বি অর্থাৎ হ্যাঁ এবং না-কে
ধারণ কর তুমি, তাই তুমি দ্বিধা > দ্বি + ধা!

তবুও
তোমাকে ভা ল বা সি! ...

বিশদ পিপাসা

অসামান্য জল, কেমন আছে(ন)?
আমি
সামান্য শিশির বলিতেছিড়

অসামান্য জলের ধারায় মিশিয়া যায় গো
সামান্য শিশির!
সামান্য শিশিরে রূপ পায় অসামান্য জলের ধারা!

আমি ও আপনি
রূপভেদে সামান্য শিশির ও অসামান্য জল
কিংবা অসামান্য জল ও সামান্য শিশির।

শিশিরকণায় হাসিতেছে পিপাসার জল,
জীবনেষু
তবুও (বি)ভ্রমে
ভ্রমণ করিতেছে নিখিলের সন্ধানে ...

বুঝিতে চাহে না,
কাজলা দীঘির মনে যদি গহীন পিপাসা মিটে
তবে
বিশদ সমুদ্রের প্রয়োজন নায়! ...

মারুফুল আলম

জন্ম ১ জানুয়ারি ১৯৭০ যশোরে। বাংলাদেশের লিটলম্যাগাজিন মুভমেন্ট সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানবিরোধী আন্দোলনের এক্টিভিস্ট। ১৯৯৪ সাল থেকে সম্পাদনা করে চলেছেন শিল্প ও আত্মচৈতন্যের ছোটকাগজ 'প্রতিশিল্প'। অর্জন করেছে 'কলিকাতা লিটলম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র পুরস্কার'। ইতোমধ্যেই লাভ করেছে 'লিরিক' (চট্টগ্রাম) ও সমুজ্জ্বল সুবাতাস' সম্মাননা এবং 'লোক' (ঢাকা) সাহিত্য পুরস্কার।

কাব্যগ্রন্থ: স্তব্ধতার ধারাবিবরণী (২০০৫), ঝরাপাতা শূন্যতার ঘ্রাণ (২০১৭)

প্রবন্ধগ্রন্থ: লিটলম্যাগাজিন, প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা এবং সুবিমল মিশ্র (২০১৭)

প্রলাপ গাথা - ১

আমাকে বোঝে নি কেউ জামরুল পাতা
করোটি ছুঁয়েছে তোর স্মৃতির সুবাস
বরফের পাটাতনে উবু হ'য়ে আছি
চোখের কুসুমে ওড়ে তরল আকাশ!

আমি তো আমাতে নেই দেহের বাকল
আবাল্য সখিরা এসে নিয়ে গেছে ঘরে
সেখানে ডাকিনী রাত বাদুড়ের ডানা
এ-দেহ মথিত করে ত্রিভুজ-আদরে

আমাকে বোঝে নি কেউ জামরুল পাতা
বরফের পাটাতনে উবু হ'য়ে আছি...

প্রলাপ গাথা - ২

শান্তনু চৌধুরী-কে

অতিকায় চাকু হাতে বেহায়া বণিক
আপন রীতিতে তুমি কেটেছো আপেল

ভেতর বাসনা কাঁদে অতল জলের
ক্রীড়ারত আঁধারের অচেনা অসুখ

জোছনার যাদুলতা গিয়েছিলো কবে?
পাথরের চোখ ছুঁয়ে শ্মশানখানায়...

শকুনের করোটিতে শবের সুবাস
ধেই-ধেই নৃত্য করে রাহুর পিরিচ

আকাশে আকাশ নেই পোয়াতী পাতাল!
তবে কি আঁধার আজ অধুনা আলোক?

পোড়া ছাই পোড়া ছাই আগুনের স্মৃতি--
নিয়ত নিজেকে খুঁড়ে জ্বালাবো উনুন...

প্রলাপ গাথা - ৩

মাসুদ খান-কে

অশোক কাননে কাঁদে সতী বিবি সীতা।
মোহের বারুদে খাক্ আমাদের পিতা ॥

কালের কুকুর ডাকে নিরংশু-নগরে।
বেহায়া বালক ভাঙে শ্রীমতীর ঘরে॥

ঝিনুকের নাভিমূলে নেচে ওঠে ঝড়।
দেহের বাকল খুলি শিকড়-বাকড় ॥

মুখস্থ মলনে খুন দ্রাবিড়-কুমারী।
ঘাসহীন দেহ ভাসে স্নানরতা নারী ॥

কাচমুখি বালুকণা পাঠায় শমন।
নদীকূলে জল নেই বোধের বমন ॥

কামুক ও মাতালেরা ডুবুডুবু পাপে।
সতত আলোক তলে প্রেতছায়া কাঁপে ॥

প্রলাপ গাথা - ৮

আগুনে পুড়েছে রোদ সভাসদসহ
ক্রন্দনে চড়িয়া সুখ দুঃখপুরে যায়

অতনু আগুন বটে শিলালিপি বোঝে
নৈশবিদ্যালয়ে মেয়ে নিজেকে হারায়

মগজ শুকিয়ে কাঠ, অগ্নি-দগ্ধ-ঘাস
আমার বোনের বুক ক্রমশ সাহারা ...

তবু আমি দেখি নাই সুফলা হলুদ
স্মৃতির ত্রিশূল কেন উহারেই খোঁজে?

উন্মাদ ঈশ্বরী তুমি... গাড়োল বাতাস
গণিকা স্বভাবে খাও চোখের বারুদ

এই ভাষা বোঝ তুমি, রোদের আবহ?
প্রেতযোনি অন্ধকারে অস্থি চেটে খায়

কতকাল ঝুলে আছো ফিনিশীয় তারা?
একেলা রোদন করে আহত আকাশ!

আগুনে পুড়েছে রোদ সভাসদসহ
ক্রন্দনে চড়িয়া সুখ দুঃখপুরে যায়...

প্রলাপ গাথা - ৫

আজ এই বিষণ্ন বয়স। অগ্নি-দগ্ধ ঘোর। মগজে মদের পিপেড় হা মুখে একাকী হাসে ধুলোবর্ণ অবিনাশী দাঁত। মুগ্ধ চোখে ইদানিং লিখে রাখি গাধার প্রতিভা! লোনা জলে জমে থাকা তীব্র শাদা তুলোর বিনাশ... প্রাচীন কয়েদী মেঘ ঘোলা- জলে বিদ্ধ করে মাছ। নদীকূলে তবু আমি মৃতবৎ শুয়ে আছি একা ।পাথরের অভিমানে দলছুট মেধাবী মানবড় শীতল আঁধার খুঁড়ে মেলে ধরে সহসা কপাট। সময়ের সিঁড়ি ভেঙে দাউ দাউ নেমে আসে ক্রোধের আগুন। নগ্ন এই বিষণ্ণ বয়স। অগ্নি-দগ্ধ ঘোর...

প্রলাপ গাথা - ৬

হলুদ হতেছে রোদ... ক্রোধ ও কাম।
যদিও ব্রহ্মাণ্ড আজ মেঘের মোকাম।।

উন্মার্গ ব্রতের জলে, নেচে ওঠো; প্রাণ।
চক্রাকারে ঘুরিতেছে, জান-পহেচান।।

আগুনে পুড়িয়া খাক, হাড়-মাংস-ত্বক।
ছায়াকে ধারণা হ'তে দেখিনি পৃথক।।

অন্ধকারে দৃশ্যমান বোধি-বৃক্ষ ডালে।
বিজনে বসিয়া সাঁই, ধূসর সকালে।।

গতিপথে পড়ে আছে পথিকের চোখ।
পেছনে বিনাশ ওড়ে,সম্মুখে আলোক।।

শালবনে একদিন, জলের ভেতর।
ধানরাঙা চাঁদ হাসে অতি মনোহর।।

কমলা উদরে কার সাজিয়েছো চিতা?
জরায়ু ছুঁয়েছে জল, ...জনক দুহিতা।।

প্রগাঢ় চুম্বনে মেঘ কতদূরে যায়?
ফালা-ফালা কার দেহ রৌদ্র-ছুরিকায়??

প্রসারিত মহাকাল... মন উচাটন
নদীকূলে জেগে আছিড় ইতি, অভাজন।।

মানুষ

আদিতে আদম ছিল দারুণ চঞ্চল আর ধাবমানড় বিজ্ঞের মতন না ভেবেই বলা যায়,গৃহে মতি ছিল না তাহার। তক্ষুণি গুরু বললেন: হবে, লাগে রাহো...।

আমি তো লজ্জায়... তদুপরি দারুণ চঞ্চল, উড়নচণ্ডী-অসুর, আজন্ম একাকীড় দ্রুত ধাবমান আদিম আদমড় তাঁর কথা প্রকাশিবোড় কহিবোইড় খাস-দিলে এইরূপ মনস্থ করেছি।

মানবকে বলা হ'লো: স্থির হও। অনন্তর, হইয়া গেল। আদম আপন কক্ষপথে স্থির হইলড় এমনকি গৃহে মতি হইল তাহার! আর তক্ষুণি গুরু বললেন: ফোট্, তোকে দিয়ে কিস্যু হবে না...।

শরমেন্দহ হয়েছি গুরু, না বুঝে করেছি ভুল
ক্ষম মোরেড় এই অভাজন
করিছে মিনতি তব পা-য়
তোমার বিহনে হায়! হয়ে আছি বেয়াকুল
অতিক্ষুদ্র শিষ্য হ'য়ে বেঁচে-বর্তে আছি
মাজনুন আমরা ক'জন।

গুরু বিনে গতি নাই-
গুরু বিনা মিথ্যে সবই আজিকার সব লেন-দেন!
মারহাবা, সন্দেহের মেঘ ফুঁড়ে চক্‌চকে হিরোর মতন
এতক্ষণে গুরু
টুথপেস্ট-মার্কা হাসিলেন।

ক্রমে-ক্রমে সেই হ'তে ভক্তিব্রত শুরু...
এই হেতু, শেষতক্‌ড়
আমি কিন্তু আদৌ পলায়ন করি নাই,
গুরুস্নেহে দিলখুশ আছি।

কে তুমি অপ্সরী?
দমে-দমে জপো গুরুনামড় অন্যথায়
গুরু কিন্তু ভীষণ মাইন্ড করবেন।

তদুপরি, হায়
গুরুগৃহে ফিরে যাচ্ছে মেধাবী স্নাতক!
হুল বিদ্ধ করিতেছে ঈর্ষার মৌমাছিড়
যদ্যপি গুরুর স্নেহে আছি দিলখুশ।

গুরু হে, তুমিও কি অচঞ্চলড় কলিযুগে হ'তে চাও শুধু মানুষ!?

অংশত ঘুম বিষয়ক

নিঃশব্দে নিহত হইড় অতঃপর ঢুকে পড়ি লাশকাটা ঘরেড় এইরূপ দৃশ্য হেতু সশব্দে হাসিয়া ওঠে প্রসূতি সদনড় নিত্য আসে প্রাণ-পক্ষীড় নিত্য আসে, যায়ড় আহা হাড়ের পিঞ্জরে শুনি ডাকিনীর উচ্চকিত হায়েনার হাসিড় এসো হে সুজন তুমি দু'চোখ তালুতে রেখে, পুনর্বার শূন্যে ছুঁড়ে দেইড় চোখের নিমিষে চোখ কী ভীষণ উড়ে উড়ে দূরে চ'লে যায়ড় অস্তিত্বের ভরবিন্দু যেন এক অতিকায় অলীক কুসুমড় ছায়াকে পেছনে রেখে, ক্রমাগত ফুটিতেছে, ব্রহ্মাণ্ডের এই গৃহ; কমলা উদরেড় নৈঃশব্দের নগ্ন-নীল-হিম এরিণায়, নিভৃতে নিহত হইড় ধীরে-ধীরে, অনন্তর নেমে আসে অলৌকিক ঘুম।

সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : এই ঘুম ক্ষতিকর নয়, যেহেতু; আলোর সাথে আঁধারের অপরূপ আমূল প্রণয়...।

চতুর্দশপদী

মেঘের মোকামে আছিড় গুরু হে, প্রণাম
গিলোটিন ঝুলে আছে মাথার উপরে।
ভেঙেছি সরল রেখা, মেঘের মোকাম...
দূরদর্শী নই ব'লে ভেঙেছি পাঁজরে।

তদুপরি, মেঘমালা মুগ্ধ; অর্থহীন
নক্ষত্র-কুণ্ডলী ওড়েড় অন্ধ অভিপ্রায়
অনন্ত যাত্রার পথ, দীর্ঘ, অন্তহীন...
নৈঃশব্দের কোলাহলে যে দিকে তাকাই-

দেখি, খণ্ডিত মস্তক হাতে ধাবমান
ছুটিতেছে কালের সিমারড় সূর্যোদয়ে
অনন্তর, ঢুকে পড়ে মেঘের কাহিনী...
যাহা বড় সুমধুর; অমৃত সমান।

মেঘের মোকামে গুরু, আমি মেঘ ঋণী
সূর্যমোহে জেগে আছি- তোমার অভয়ে।

ক্রন্দনঘর

মেঘের ভেতর ঘুমিয়ে ছিলাম মনে আছে তোমরা ছিলে হয়তো ছিলে কেউ জানো না পায়ের পাতায় তীব্র নেশা বাইরে যাবার অন্ধকারে উঠতো যে চাঁদ নীরব ঘরে তৃপ্ত মায়ায় কেউ কি মানো কেউ মানো না কেমন ক'রে অষ্টপ্রহর আসতো খাবার মদের মত এমনি ক'রে ঘুমিয়ে ছিলাম সুস্থ জ্বরে মেঘের ভেতর তুলতুলে এক মোমের দেয়াল বন্ধু ছিলো পরম সুখে আমার খবর বলতো জানি তাহার কাছে রমণ-রোগে আটখানা সে পৌছে দিতো আলোর ঝিলিক সূর্যটাকে রাখতো ঢেকে মোহন মায়ায় বেলুন যেমন অনায়াসে রুদ্ধ করে মুগ্ধ বাতাস ক্রমে ক্রমে হাড়ের প্রেমে বন্দী হলাম রক্ত জলে বিদ্ধ মগজ অলীক শরীর পায়ের পাতায় তীব্র নেশা বাইরে যাবার ডুব সাঁতারে বাইরে এলাম নষ্ট গ্রহে দু'হাত ভরা বিশাল স্মৃতির বৃক্ষ এখন মেঘের মায়ায় কাঁদতে থাকে কাঁদতে থাকে...

রিসি দলাই

জন্ম ২৩ নভেম্বর ১৯৭৫, মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার পাত্রখোলা চা বাগানে। সম্পাদনা করছেন 'চারবাক' ও 'সরলরেখা'। যুক্ত আছেন সাপ্তাহিক সাহিত্য আড্ডা 'শুক্কুরবারের আড্ডা'র সাথে। লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহ ও প্রদর্শন কেন্দ্রের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

কাব্যগ্রন্থ: মায়াহরিণ (২০০৮), নাচঘর (২০১২), এবং মুখোশ (২০১৬), করোনাকালে (২০২২)

প্রবন্ধ: বুদ্ধিজীবীর দায়ভার (সম্পাদনা, ২০০৯), পক্ষ-প্রতিপক্ষ অথবা শত্রু-মিত্র (২০১০), নির্বাচিত চারবাক (সম্পাদনা, ২০১১), ভাষা সাম্প্রদায়িকতা অথবা সাম্রাজ্যবাদি খপ্পর (২০১৩)

নগ্ন-রাক্ষস

ট্রমার মধ্যে ডুবে যাই
তলিয়ে যেতে যেতে হলুদাভ আমি
দেখি সবকিছু হলুদ হলুদ হলুদ
নিঃসঙ্কোচ আত্মদহনে দগ্ধ

পরিবর্তন কোথায়?

নিঃশেষ হবার আনন্দে একটা ফড়িঙ
উড়ছেই শুধু উড়ছে
এলোমেলো
কতকিছু আঁকছে দেয়ালে
হ য ব র ল

২৯ জুন ২০২৫

ক্রীতদাসের হাসি

এখন গোলাপের মৌসুম

চারদিকে এতো এতো গোলাপ
তবু সুগন্ধ কই?

জৌলুস আর অট্টালিকায় ঢাকা
হৃদয়ের ভার

গোলাপ ফুটেছে- এতো এতো গোলাপ
তবু হাসি নাই

বুদবুদে মিলিয়ে গেছে বুকের পারদ...

২৭ নভেম্বর ২০২৩

তবু সমর্পিত

হয়তো থেমে যাওয়া মৃত্যুই, তবু থামতে হয়
রঙিন তারাবাতি আর দু'আঙুলে শৈশবের মার্বেল
ঘুড়ির ডানায় উধাও
কে যেন কানে কানে বলে ভাঙনের গান
দেখেছি আমি মুহূর্তে ধ্বসে যেতে
পৃথিবী গভীরতম ক্ষত

ক্ষতটুকু একটু বড় করে ফেলা এইতো
আর একখণ্ড চমৎকার মায়া
পর্দার মতো ঝুলতে থাক
আবছা বারান্দায়-

২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩

কীনব্রিজে বিকেলের রোদ

চলমান রিকসা পেডেলে রোদগুলো ধাক্কা খেতে খেতে
আত্মহত্যা করছিলো সুরমার জলে
ঢেউয়ে স্থবির নামতা গুণছিলো কে যেন

ছুটে যাচ্ছিলো শেষ বিকেলের ট্রেন কীনব্রিজ থেকে

মাত্র কয়েক মিনিট
আজো দেখতে পাই
কীনব্রিজের উপর থেকে

বিকেলের শেষ ট্রেন
অপেক্ষমান এক প্রেমিকার আর্ত-চিৎকার
উপেক্ষা করে
ছুটে চলছে
অবিরাম
অজানা গন্তব্যে...

১৭ জুন ২০২০

আদমসুরত

সুশোভন একটি চপ্পল
জানান দিচ্ছে নিজেকে
ঘুরে ঘুরে
কী কাজে লাগে চপ্পল?
নকশাদার সুন্দর
অনেকটা মানবীয়
নৈতিকও বটে!
সময়ের মানদণ্ডে গুণছেন কেউ কেউ

অতীতের এক স্ফিনিক্স পাখি ভাসছে দু'চোখে
আশাহত ঐতিহ্যের বেদনাদায়ক পরিসমাপ্তি
চপ্পল ঘুরে মগজের কোষে
আর প্রলম্বিত হয়
তৃতীয় গণতন্ত্র
সুপ্তি জাগরণ

১৪ এপ্রিল ২০২০

তিতাস

গেঁথে থাকা স্মৃতির পরশ শৈশবে
আহ্ তিতাস
কখনো উত্তাল উদ্দাম ছিলে কি
যতবার দাগ কেটে পার হয়ে যাই ওপাড়ে
রেশটুকু থেকে যায়
প্রচন্ড ঝাঁকুনি দেন অদ্বৈত-মাহমুদ
উঠতি কিশোরীর দুলতে থাকা বেণীর লাজ
এখন সে এক মরা নদী
তবু যতবার তাকাই উচ্ছ্বল প্রাণবতী
যুবতী এসে দাঁড়ায়

ছোট ছোট পালতোলা নৌকা
দুলতে থাকে তিতাসের জলে
কৈবর্তপাড়া আর দুয়েকটি
হেলে থাকা ভাঙা বাড়ি

আশ্চর্য বিদ্যুৎ মগজে
চাবি মাইরা দিসে ছাইড়া...

০৮ জুন ২০২৪

ট্রেন কখনো কারো জন্য থেমে থাকে না

নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছেও কখনো কখনো
টা টা বাই বাই
সবই তকদির কা খেল
সীমানার দেয়াল
যায় না ভাঙা

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হয় শুধু
কারো চলে যাওয়া

হৃদয়ের ক্ষরণ এমনই
অবসন্ন এক বিকেল

১৬ জুন ২০২৪

অর্ধেক গ্লাস পূর্ণ গ্লাস বিষয়ক জটিলতা

কাটলো না ধাঁধা আজও
জলের গ্লাস অর্ধেক দেখে
কেউ কেউ বলবেন পুরোটাই ফাঁকা
আবার বিপরীত দেখা যায়
বলবেন কেউ কেউ পুরোটাই ভরা

রহস্য ঘুচলো না
শুধু ধাঁধাটুকু বড় হয়ে যাচ্ছে

জল গ্লাস আর ফাঁকাটুকু ছাড়া...
১৮ জুন ২০২৪

প্রতিলিপি

আস্থা যাদের প্রমাণে তাদের জন্য তিন উল্লাস
সবকিছু যায় না ধরা প্রমাণে
বাইরে থেকে কতকিছু দেখি আমরা
শ্বাশত মরিচিকা
বিশ্বাস থাকুক দূরে
তর্কে অধরা
বিশ্বাসী তুমি
কেন ভাই মিছে
করো অপমান নিজেরই
বিশ্বাস প্রমাণে হয় না বিচার

আছি আমি অস্তিত্বশীল
এই সত্য
আর সব মিছে...

০৭ মার্চ ২০২৫

হত্যার মহোৎসবে

এতো এতো হত্যার মহোৎসবে
আপাতত স্থবির আমরা
বাকশূন্য
মব ছড়িয়ে কারো দানবঅভিপ্রায়
কোথায় দাঁড়াবে
এই বাংলা
দুর্জন অভিপ্সা তোমার
রক্তে প্রগতি লেখা
মানুষ নিযুত বছরের তপস্যা
বহু মত বহু পথে
কোথায় দাঁড়াবে শেষে

মানুষেই ফেরা শেষতক
এইতো দাঁড়িয়ে আছি
করো হত্যা

নিজের ভেতর ভাঙচুর প্রতিক্ষণ
চলছে...

০৮ মার্চ ২০২৫

'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই'

বাংলা একাডেমির সাম্প্রতিক প্রকাশনা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের গল্প ॥ সম্পাদক : হুমায়ূন শফিক	৭০০.০০
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রবন্ধ ॥ সম্পা. সহুল আহমদ	১০০০.০০
মশাররফ রচনা-সম্ভার ১ম খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ) ॥ সম্পা. কাজী আবদুল মান্নান	৯৮০.০০
শহীদুল্লাহ্ রচনাবলি ১ম খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ) ॥ সম্পা. আনিসুজ্জামান	১২৮০.০০
আবুল মনসুর আহমদ রচনাবলি ৫ম খণ্ড ॥ সম্পা. নুরুল আমিন	৮০০.০০
আবদুল হক রচনাবলি ১ম খণ্ড ॥ সম্পা. সৈয়দ আজিজুল হক	৯০০.০০
শামসুর রাহমান রচনাবলি ৩য় খণ্ড ॥ সম্পা. মফিদুল হক	১১০০.০০
একুশের প্রবন্ধ ২০২৪ ॥ প্রধান সম্পা. মোহাম্মদ আজম	৭৬০.০০
মীর-মানস (পুনর্মুদ্রণ) ॥ মুনীর চৌধুরী	৩৬০.০০
ব্যবহারিক পরিভাষা (পুনর্মুদ্রণ) ॥ সংকলন ও সম্পাদনা : সুব্রত বড়ুয়া	২৬০.০০
প্যারিসে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ ॥ মাহমুদ শাহ্ কোরেশী	৩২০.০০
দীনেশচন্দ্র সেন ও লোককাহিনির মঞ্চ-পরিবাহণ ॥ ইউসুফ হাসান অর্ক	৪৪০.০০
বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী তঞ্চঙ্গ্যা ও পাঙ্খোয়া ॥ মুস্তাফা মজিদ	৬৪০.০০
ডিজিটাল যুগে চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রস্তুতিপর্ব ॥ মুহাম্মদ সাজ্জাদ আহসান	৪০০.০০
বাংলা খেয়াল ৩য় খণ্ড ॥ আজাদ রহমান	৫৮০.০০
ব্যবসা সংস্থাপন ও আমদানি রপ্তানি ম্যানুয়েল ॥ আবুল কাসেম হায়দার	২২০.০০
বাংলাদেশে শিশুশ্রম : সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ॥ মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী	৪৪০.০০
চট্টগ্রামের বলী খেলা ॥ আহমদ মমতাজ, রাইহান নাসরিন	৩৪০.০০
উদার নারীবাদ ও রোকেয়া : দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিত ॥ ফাহিমা আক্তার	২৫৬.০০
সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও তাঁর বিখ্যাত আবিষ্কার ॥ গোলাম মোহাম্মদ ভূঞা	৩৪০.০০
কায়কোবাদ : কবি ও কবিতা ॥ ফাতেমা কাওসার	৬০০.০০
জহির রায়হানের চলচ্চিত্র মানুষের অধিকার ও মুক্তিযুদ্ধ ॥ আফরোজা পারভীন	৪০০.০০
সেলিম আল দীনের নাটক : আধার ও আধেয় ॥ সাইফুল ইসলাম	৪৭২.০০
Poems that came to me : Bengali poetry in English Translation ॥ Selected &Translated by Sonia Amin	৩৪০.০০
Selected poems : Rudra Muhammad Shahidullah ॥ Translated by Mohammad Shafiqul Islam	৩০০.০০

বাংলা একাডেমি

৩ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০

ফোন : ৫৮৬১১২৪৮ ফ্যাক্স : ৯৬৬১০৮০, পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র : ৫৮৬১১৩২৫

bacademy55@gmail.com ওয়েবসাইট : banglaacademy.gov.bd

এখন জনতা ব্যাংক ডিপোজিট পেনশন স্কীম আরো সহজ শর্তে ও বেশি মুনাফায়

মাসিক কিস্তির পরিমান	মেয়াদ পূর্তিতে এককালীন প্রদেয়	
	৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী	১০ (দশ) বছর মেয়াদী
৫০০	৩৮,৬১৪	১,০০,৮০৪
১,০০০	৭৭,২২৯	২,০১,৬০৮
২,০০০	১,৫৪,৪৫৯	৪,০৩,২১৬
৫,০০০	৩,৮৬,১৪৭	১০,০৮,০৪২
১০,০০০	৭,৭২,২৯৫	২০,১৬,০৮৪
১৫,০০০	১১,৫৮,৪৪২	৩০,২৪,১২৬
২০,০০০	১৫,৪৪,৫৯০	৪০,৩২,১৬৮
২৫,০০০	১৯,৩০,৭৩৭	৫০,৪০,২১০

এই হিসাবের সুবিধাসমূহ

- মাসের যেকোনো তারিখে হিসাব খোলা এবং কিস্তি জমা দেয়া যায়।
- মুনাফার হার ১০% চক্রবৃদ্ধি হারে।
- অনলাইন এবং eJanata এ্যাপ্সের মাধ্যমে কোন চার্জ ছাড়া টাকা জমা দেয়া যায়।
- হিসাবধারী মারা গেলে নমিনী হিসাব পরিচালনা করতে পারবেন।
- আবগারী শুল্ক এবং আয়কর বাদে অন্য কোনো সার্ভিস চার্জ নেই।
- হিসাবের বিপরীতে ঋণ সুবিধা আছে।
- পিতা/মাতার পরিচালনায় নাবালকের নামে হিসাব খোলা যায়।

এই স্কীমটি খুলতে আপনার নিকটস্থ জনতা ব্যাংকের যেকোনো শাখায় আজই যোগাযোগ করুন

জনতা ব্যাংক পিএলসি.
উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার
www.jb.com.bd

সূত্র: পিআরডি/ডিসপ্লে/২০২৫/৫৯৫ তারিখ: ২৮.০৮.২০২৫

একটি নিরাপদ বিনিয়োগ গড়ে
দিতে পারে আপনার পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা
রূপালী ব্যাংকের
আকর্ষণীয় মাসিক সঞ্চয়ী স্কিম হোক সেই নিশ্চয়তা
রূপালী ব্যাংক পিএলসি
RUPALI BANK PLC
www.rupalibank.com.bd

পত্র নং- প্রঃকাঃ/পিআরডি/বিজ্ঞাপন/৭১০/২০২৫ তারিখঃ ২৭-০৮-২০২৫

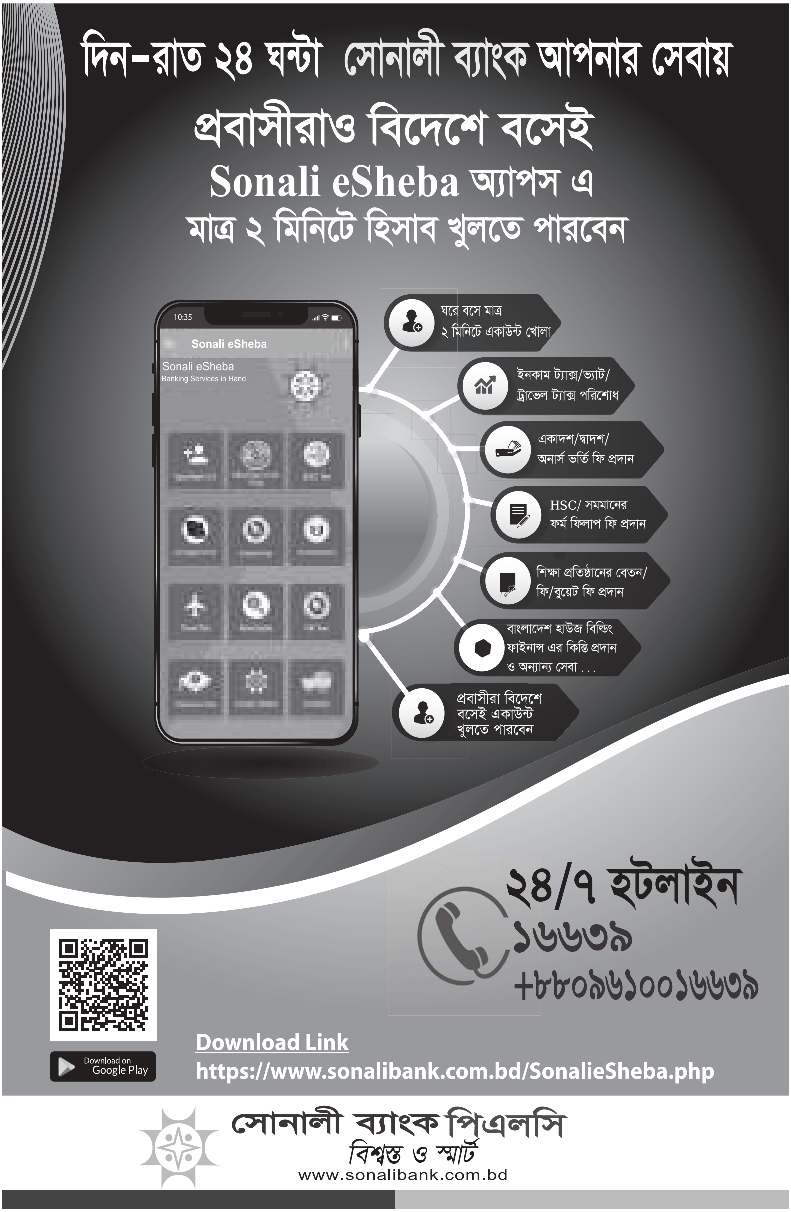
দিন-রাত ২৪ ঘন্টা সোনালী ব্যাংক আপনার সেবায়
প্রবাসীরাও বিদেশে বসেই
Sonali eSheba অ্যাপস এ
মাত্র ২ মিনিটে হিসাব খুলতে পারবেন
10:35
Sonali eSheba
Sonali eSheba
Banking Services in Hand
ঘরে বসে মাত্র
২ মিনিটে একাউন্ট খোলা
ইনকাম ট্যাক্স/ভ্যাট/
ট্রাভেল ট্যাক্স পরিশোধ
একাদশ/দ্বাদশ/
অনার্স ভর্তি ফি প্রদান
HSC/ সমমানের
ফর্ম ফিলাপ ফি প্রদান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন/
ফি/বুয়েট ফি প্রদান
বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং
ফাইনান্স এর কিস্তি প্রদান
ও অন্যান্য সেবা . . .
প্রবাসীরা বিদেশে
বসেই একাউন্ট
খুলতে পারবেন
২৪/৭ হটলাইন
১৬৬৩৯
+৮৮০৯৬১০০১৬৬৩৯
Download on
Google Play
Download Link
https://www.sonalibank.com.bd/SonalieSheba.php
সোনালী ব্যাংক পিএলসি
বিশ্বস্ত ও স্মার্ট
www.sonalibank.com.bd

আমাদের প্রকাশনা

চারবাক

বাংলাদেশের কণ্ঠস্বর

Please Visit
www.risidalai.com
www.charbak.com

খোলা জানালা...

আমরা দেশ ও বিদেশের লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে
একটি সংগ্রহশালা করতে যাচ্ছি

লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহ ও প্রদর্শন কেন্দ্র

আরবিএস নাজমা টাওয়ার, ৬৪/সি/১ আর কে মিশন রোড, টিকাটুলি, ঢাকা
+৮৮ ০১৫৫২৪১৯৪৪২, editor_charbak@yahoo.com